ই. এইচ. আই—৭
ইতিহাসের ঐচ্ছিক পাঠক্রম
পর্যায় ঃ ২৬

একক ১ □ ভিয়েনা সম্মেলন, ইউরোপীয় শক্তি সমবায় ও মেটারনিখ ব্যবস্থা

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ ভিয়েনা সম্মেলন

১.৪ ভিয়েনা ব্যবস্থা

১.৫ ভিয়েনা ব্যবস্থার রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য

১.৬ ভিয়েনা ব্যবস্থার সমালোচনা

১.৭ পবিত্র চুক্তি

১.৮ ইউরোপীয় শক্তি সমবায়

১.৯ শক্তি সমবায়ের ব্যর্থতা

১.১০ মেটারনিখ ও মেটার ব্যবস্থা

১.১১ সারসংক্ষেপ

১.১২ অনুশীলনী

১.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন—

- নেপোলিয়নের পতনের পর বিপ্লবের গতিরোধ করবার জন্য ইউরোপের রাজন্যবর্গ ও রক্ষণশীল রাজনীতিকরা কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।
- ফরাসি বিপ্লবের পূর্ববর্তী অবস্থা ফিরিয়ে এনে তাকে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে কীভাবে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমবায় গড়ে উঠেছিল।

১.২ প্রস্তাবনা

১৮১৫ সালে নেপোলিয়ানের চূড়ান্ত পতনের পর ইউরোপের রাজন্যগোষ্ঠী ও রক্ষণশীল নেতৃত্বের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মহাদেশ থেকে বিপ্লবের প্রভাব মুছে ফেলা, বিপ্লবের সময়ে ক্ষমতাচ্যুত শাসককে আবার সিংহাসন ফিরিয়ে দেওয়া, বিপ্লব-পূর্ববর্তী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক কাঠামোর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং সেইসঙ্গে লক্ষ্য রাখা, যাতে আবার বিপ্লবের কোন ঢেউ ফ্রান্সকে বা ইউরোপীয় মহাদেশকে আঘাত করতে না পারে। অবশ্য এই সুযোগে ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক কিছু অতিরিক্ত সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যও যে কোন কোন রাজা বা নেতার ছিল না, তা নয়, তবে মূল কথা ছিল রাষ্ট্র ও সমাজকে রক্ষণশীল কাঠামোর মধ্যে আটকে রাখা। এই কাজ যে বিপ্লব-পরবর্তী পরিস্থিতিতে কোন একক রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়, তা বুঝতে পেরেছিলেন অস্ট্রিয়া বা রাশিয়ার সম্রাট। তাই তারা রাষ্ট্রসমবায় গঠন ও যৌথ দমনব্যবস্থার কথা ভেবেছিলেন। এই ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন মেটারনিখ ও তাঁর সহযোগীরা। কীভাবে রূপায়ণটি ১৮১৫ থেকে ১৮৪৮ সালের মধ্যে কার্যকর ছিল, সেটাই আপনারা নিম্নের আলোচনা থেকে জানতে পারবেন।

১.৩ ভিয়েনা সম্মেলন

১৮১৪ সালে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন নেপোলিয়ান। দুই দশকের যুদ্ধের ক্ষত সারিয়ে শান্তির জন্য, স্থিতির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন রণক্লান্ত মহাদেশীয় রাষ্ট্রনায়করা। বেলজিয়ানের রাজা লিওপোল্ড বলেছিলেন, "In Europe's state of social illness it would be unheard-of to let loose...a general war, Such a war...would certainly bring a conflict of principles, (and) from what I know of Europe, I think that such a conflict would change her form and overthrow her whole structure." পুরনো কাঠামোর এই ভাঙনকেই সবচাইতে বেশি ভয় পেয়েছিলেন তাঁরা। হব্‌স্‌বম তাই ভুল বলেননি যে, তাঁরা আগের চাইতে বেশি কুশলী হয়ে উঠেছিলেন তা নয়, তাঁরা আগের উগ্রতা ত্যাগ করে শান্তির পূজারী হয়ে পড়েছিলেন তাও নয়। তাঁরা ছিলেন আতঙ্কিত, সন্ত্রস্ত। পরিবর্তনের ভয় তাঁদের পেয়ে বসেছিল। তাই সেই পরিবর্তনকে ঠেকানোর জন্য তাঁরা একজোট হয়েছিলেন। ১৮১৪ সালে মিলিত হয়েছিলেন ভিয়েনা বৈঠকে। প্রকাশ্যে এই ভিয়েনা কংগ্রেসের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস। সম্মেলন চলেছিল ১৮১৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৮১৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত। সম্মেলনের মুখ্যসচিব ছিলেন অস্ট্রিয়ার ফ্রিডরিখ ফন গেনৎস্।

অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় আহূত বৈঠকে তুরস্ক ছাড়া ইউরোপের প্রায় সব রাষ্ট্রে প্রতিনিধিরাই হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের কাজ চালানোর ভার প্রধানত পড়েছিল চারটি রাষ্ট্রের ওপর—অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া ও ইংল্যান্ড। এর মধ্যে আবার প্রকৃত অর্থে সক্রিয় ছিল শুধু রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া। কারণ, ইংল্যান্ডের দুই প্রতিনিধি ক্যাসেলরি আর ওয়েলিংটন নিজেদের কিছুটা দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন, কংগ্রেসের চরিত্রের সঙ্গে তাঁরা খাপ

খাওয়াতে পারেননি। অন্যদিকে প্রাশিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিক উইলিয়ম সব ব্যাপারেই রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডারের ওপর নির্ভর করতেন।

জার প্রথম আলেকজান্ডার কিন্তু ছিলেন উদারপন্থী। পোল্যান্ড ও ফিনল্যান্ডকে তিনি স্বায়ত্তশাসন দিয়েছিলেন। ১৮১৪ সালে নেপোলিয়ন হেরে যাওয়ার পর বিজয়ী সেনাদের হাতে চরম নিগ্রহের হাত থেকে তিনিই ফ্রান্সকে বাঁচিয়েছিলেন। অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর মেটারনিখ তাই প্রথম থেকেই তাঁকে আড়াল করে কৌশলে কংগ্রেসের কাজ নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। আলেকজান্ডার রাজনীতি ও ধর্মনীতিকে মিশিয়ে ফেলার চেষ্টা করায় মেটারনিখের কাজ আরও সহজ হয়ে যায়। তিনি জারকে 'অব্যবস্থিত-চিত্ত' হিসেবে সকলের সামনে তুলে ধরে বলেন, 'he is a mad man to be humoured'। ফলে শেষ পর্যন্ত ভিয়েনা কংগ্রেস-এর অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রপুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন মেটারনিখ।

১.০ উদ্দেশ্য

ভিয়েনা কংগ্রেসের সামনে উপস্থাপিত সমস্যা ছিল অনেক। সেসবের সমাধানও ছিল বহু আলোচনা ও সূক্ষ্ম কূটনীতি সাপেক্ষ। তবে মুখ্যত তিনটি নীতিই ভিয়েনা সম্মেলনের ভিত্তি হিসেবে গৃহীত হয় : প্রথমত, বিজয়ী মিত্রপক্ষের জন্য পুরস্কার ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা এবং ফ্রান্স ও তার সহযোগীদের জন্য শাস্তিবিধান; দ্বিতীয়ত, ইউরোপের রাষ্ট্রব্যবস্থায় যথাসম্ভব প্রাক্-বিপ্লব অবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং তৃতীয়ত, ইউরোপের ভবিষ্যৎ স্থিতি অব্যাহত রাখার বন্দোবস্ত।

ভিয়েনার প্রথম নীতি অনুসারে, নেপোলিয়ানকে হারানোর পুরস্কার হিসেবে রাশিয়া, প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, গ্রেট ব্রিটেন এবং সুইডেন কিছু কিছু ভূখণ্ড পেয়ে যায়। রাশিয়া পায় পোল্যান্ডের কিছুটা, ফিনল্যান্ড ও তুরস্কের হাত থেকে জোর করে নেওয়া ভূখণ্ড। প্রাশিয়া নেয় পশ্চিম পোম্‌রনিয়া, স্যাক্সনির অংশবিশেষ এবং রাইন প্রদেশ। অস্ট্রিয়ার ভাগে পড়ে বেলজিয়াম এবং বিচ্ছিন্ন কয়েকটি অঞ্চল ছাড়া নেপোলিয়ন যুগের আগে দখল করা গোটা দক্ষিণ জার্মানি। এছাড়া ঐ বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলির বদলে অস্ট্রিয়া পায় ভেনিসিয়া-র অধিকার। সব চাইতে লাভবান হয়েছিল গ্রেট ব্রিটেন, তার নৌশক্তি ও বাণিজ্যিক শক্তির বিচারে। সে পেয়েছিল হেলিগোলান্ড, মাল্টা দ্বীপ, স্পেন অধিকৃত ত্রিনিদাদ, ফ্রান্স-অধিকৃত মরিশাস, টোবাগো, হল্যান্ড-অধিকৃত সিংহল এবং উত্তমাশা অন্তরীপ। সুইডেনকে দেওয়া হয়েছিল নরওয়ে।

স্যাক্সনি যেহেতু ফ্রান্সের পক্ষে ছিল, তাই শাস্তি হিসেবে তার কিছু অঞ্চল কেড়ে নিয়ে দেওয়া হয়েছিল প্রাশিয়াকে, অবশ্য তার রাজকীয় উপাধি খর্ব করা হয়নি। প্রধান যুদ্ধাপরাধী ফ্রান্সকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করার কথা বলা হয়েছিল। ফরাসি কূটনীতিক ত্যালির্যাঁ এবং রাশিয়ার জার-এর বাধায় তা সম্ভব হয়নি। তবে ফ্রান্সকে তার প্রাক্‌বিপ্লব সীমান্তে বেঁধে রাখা হল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের জন্য মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করা হল। পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য একটি সম্মিলিত সেনাবাহিনী তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হল। আর নেপোলিয়ান যে ওয়ারশ গ্র্যান্ড ডাচি এবং ওয়েস্টফালিয়া রাজ্য দুটি তৈরি করেছিলেন, তার বিলোপ করা হল।

ভিয়েনা সম্মেলনের দ্বিতীয় ভিত্তি ছিল ত্যালিরাঁর 'Principle of Legitimacy' বা বৈধ অধিকারের নীতি। ত্যালিরাঁ ভেবেছিলেন, এই নীতি অনসৃত হলে ফ্রান্স খণ্ডিত হবে না, বুরবোঁ রাজবংশ ক্ষমতা ফিরে পাবে এবং পরাজিত ফ্রান্সের মর্যাদা কিছুটা রক্ষা পাবে। কিন্তু এই নীতি মেটারনিখের হাত শক্ত করেছিল এবং সব বিপ্লবী প্রভাবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিল। যাই হোক, ফরাসি সিংহাসনে বুরবঁ বংশ ফিরে এসেছিল। স্পেন ও নেপ্‌ল্‌সের সিংহাসন ফিরে পেয়েছিলেন নেপোলিয়ান যাঁদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন সেই রাজারা। পিডমন্ট-সার্ডিনিয়ায় স্যাভয় পরিবারের অধিকার এবং হল্যান্ডে অরেঞ্জ বংশের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়েছিল। ভ্যাটিকানে গদি ফিরে পেয়েছিলেন পোপ আর রাইন কন্‌ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত জার্মান রাইখের রাজন্যবর্গ তাঁদের হারানো রাজ্য ও সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিলেন।

ভিয়েনার তৃতীয় নীতিটির প্রধান লক্ষ্য ছিল ফ্রান্স ও জার্মানি। ধারণা করা হয়েছিল যে, ইউরোপের ভবিষ্যৎ শান্তি একমাত্র এই দুটি রাষ্ট্রই নষ্ট করতে পারে। তাই এই দুটো রাষ্ট্রকেই শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা ছিল ভিয়েনা সম্মেলনের উদ্দেশ্য।

ফ্রান্সের ওপর চাপ রাখার জন্য তার সীমান্তের চারপাশে শক্তিশালী রাষ্ট্রপ্রহরা স্থাপন করা হয়েছিল। উত্তরে ছিল বেলজিয়াম, তাকে হল্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। পূর্বে রাইন ভূখণ্ড-সমৃদ্ধ প্রাশিয়া, আর দক্ষিণে পিডমন্ট-সার্ডিনিয়া-জেনোয়া। মোটকথা, ভবিষ্যতে ফ্রান্স আর যাতে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে না পারে তার যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হল। জার্মানি সম্বন্ধেও একই দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকর ছিল, কেননা একটি শক্তিশালী জার্মান রাষ্ট্র ছিল অস্ট্রিয়ার পক্ষে বিপজ্জনক, তাই জার্মানিকে ভেঙে ভেঙে অস্ট্রিয়ার অভিভাবকত্বে ঊনচল্লিশটি ছোট ছোট রাষ্ট্রের একটি দুর্বল সংঘে পরিণত করা হয়েছিল। এই সংঘটির জন্য ডায়েট (Diet) নামক একটি প্রতিনিধিসভা (সংসদ) গঠন করা হল। কিন্তু তার প্রতিনিধিরা কোন নির্বাচিত সদস্য নন। সকলেই মেটারনিখের অনুমোদনসাপেক্ষ মনোনীত প্রতিনিধি।

১.৫ ভিয়েনা ব্যবস্থার রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য

ভিয়েনা সম্মেলনে গৃহীত এইসব ব্যবস্থা থেকে ইউরোপের রাষ্ট্রিক ভারসাম্য ও সে বিষয়ে প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ দেখতে পাওয়া যায়। মহাদেশীয় বিন্যাস সম্পর্কে এই বৈঠকে ব্রিটেনের তেমন কোন আগ্রহই ছিল না। ব্যাবসা-বাণিজ্য বিস্তার-এর কথাই শুধু তার মাথায় ছিল, এবং ঔপনিবেশিক স্বার্থ ইংলন্ডেরই সবচাইতে বেশি রক্ষিত হয়েছিল। রাশিয়ার মূল আগ্রহ ছিল বল্কান অঞ্চল সম্পর্কে, তবে তাকে প্রথম শ্রেণীর শক্তি হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল এবং পশ্চিম ইউরোপের ব্যাপারেও তার স্বার্থের অভিন্নতা মেনে নেওয়া হয়েছিল। সুইডেনকে বাল্টিক বহির্ভূত অঞ্চলের ওপর আধিপত্য করতে না দিয়ে ইউরোপীয় শক্তি হিসেবে তার প্রাধান্য একেবারে নষ্ট করা হয়েছিল। এরপর সে ছিল শুধুই একটি স্ক্যান্ডিনেভীয় শক্তি। অন্যদিকে মহাদেশীয় রাষ্ট্রকাঠামোর স্বঘোষিত অভিভাবকের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিল অস্ট্রিয়া। জার্মানির অবস্থা শোচনীয় হলেও কিছুটা গুরুত্ব অবশ্যই প্রাশিয়া পেয়েছিল।

১.৬ ভিয়েনা ব্যবস্থার সমালোচনা

ভিয়েনা সম্মেলন সম্পর্কে আলোচনায় পরিষ্কার দু'ধরনের মত দেখা যায়। একদল ঐতিহাসিকের মতে, "(The makers of the Agreement were) mere hucksters in the diplomatic market, bartering the happiness of millions with a scented smile". আবার অন্যদলের মতে, "(They) did in fact prevent a general European conflagration for a whole century" হ্যারল্ড নিকলসন প্রথম মতটি অগ্রাহ্য করেছেন। দ্বিতীয় মতটিকে নাকচ করে মন্তব্য করেছেন, "Wars are neither caused nor prevented by treaties." হবস্‌বম অবশ্য একথা স্বীকার করেন না। তিনি মনে করেন ভিয়েনা চুক্তি দীর্ঘদিন ইউরোপকে যুদ্ধ থেকে মুক্ত রেখেছিল। তাঁর ভাষায় : "Indeed apart from the Crimean war there was no war involving more than two great powers between 1815 and 1914. The citizens of the twentieth century ought to appreciate the magnitude of this achievement (of the Vienna Settlement)"

ভিয়েনার সমালোচকদের মতে, ভিয়েনা চুক্তি-প্রণেতাদের কূটনীতির বাজারে দরাদরিতে রত ব্যাপারী বলে মনে হয়েছে। এই কূটনীতিকরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ভিয়েনার সমালোচকগণ মনে করেন যে, এই চুক্তির প্রণেতা সকলেই ছিলেন রক্ষণশীল এবং ইউরোপের সর্বত্র যে নতুন ধ্যানধারণা আদর্শ জনজীবনকে উদ্দীপিত করতে শুরু করেছিল, তার প্রতি উদাসীন। তারা শক্তিসাম্য, ন্যায্য অধিকার প্রভৃতি বাতিল হয়ে যাওয়া আদর্শগুলির প্রতি বিশ্বস্ত থেকে মানুষের সুখদুঃখের চাইতে শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণে বেশি মনোনিবেশ করেছিলেন। ভিয়েনা সম্মেলনের সচিব গেনৎস্ (Gentz) তাই দুঃখ করে বলেছিলেন : "Men had promised the return of golden ages. But the Congress resulted in nothing but restorations."

সমালোচকদের মতে, "(the settlement of Vienna) was a network of bargains and negotiated compromises" উদ্যোক্তাদের প্রতিটি আচরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নতুন ভূখণ্ড লাভের জন্য তারা লালায়িত এবং ক্ষুদ্র ও অসহায় জাতিগুলির প্রতি নির্মম। ইউরোপের বিভিন্ন জাতিগুলির সুদীর্ঘ এবং ঐতিহাসিক সম্পর্ক তুচ্ছ করে তারা নরওয়েকে যুক্ত করেছিলেন সুইডেনের সঙ্গে এবং জেনোয়াকে তুলে দিয়েছিলেন সার্ডিনিয়ার হাতে, আবার জাতীয়তাবাদকে অস্বীকার করে বেলজিয়ামকে যুক্ত করেছিলেন হল্যান্ডের সঙ্গে, ভেনিসিয়া-লম্বার্ডিকে স্থাপন করেছিলেন অস্ট্রিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীনে। জাতীয়তাবাদ এবং উদার নীতির প্রতি এ জাতীয় অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য দীর্ঘকাল চুক্তি-প্রণেতারা ভর্ৎসিত হয়েছেন উত্তরসূরীদের দ্বারা, আর যে আদর্শ ও নীতিগুলি অগ্রাহ্য করে ভিয়েনা চুক্তি রচিত পরবর্তী প্রজন্মগুলিতে দেখা যায় ধীর নিশ্চিত পদক্ষেপে তাদেরই জয়যাত্রা। যে-সমস্ত কীটদষ্ট ও জীর্ণ শাসক পরিবারকে তারা ১৮১৪ খ্রিঃ সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত করেছিলেন ইউরোপের ক্ষুব্ধ মানুষ দীর্ঘকাল তাদের সহ্য করেনি।

আবার এই সমস্ত সমালোচনা অনেক ক্ষেত্রেই অযৌক্তিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রথমত, মনে রাখা দরকার যে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হবার জন্য অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, প্রাশিয়া, ইংল্যান্ড প্রভৃতি রাষ্ট্র পরস্পরের সঙ্গে এত প্রকাশ্য ও গোপন চুক্তি সম্পাদন করেছিল যে তাঁদের স্বাধীন আচরণের ক্ষেত্র ছিল অত্যন্ত সীমিত। সুইডেনকে নরওয়ে দেওয়া এবং হল্যান্ডের অধীনে বেলজিয়ামকে স্থাপন করার সিদ্ধান্ত বহু পূর্বেই গৃহীত হয়েছিল এবং ১৮১৫ খ্রিঃ এইসব সিদ্ধান্তবিরোধী কাজ করলে ইউরোপে নতুন করে অশান্তি সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল, যে অশান্তি দূর করাই ছিল ভিয়েনার প্রধান লক্ষ্য। তাছাড়া কাজের যে স্বাধীনতাটুকু তাদের ছিল তার সদ্ব্যবহার করতে মেটানিখ, আলেকজান্ডার প্রভৃতি রাষ্ট্রনেতারা কার্পণ্য করেননি। ইউরোপকে নতুন করে অশান্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁরা শক্তিসাম্য নীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। কোন শক্তিকে এককভাবে ইউরোপীয় শান্তির শত্রু হতে না দেওয়াই ছিল ভিয়েনা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। তাঁরা দীর্ঘকালের পুরোনো সীমান্তগুলির মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন এবং স্থায়ী শাসনের প্রচেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

ঐতিহাসিক সিম্যান এই অভিযোগ মানতে রাজী নন যে ভিয়েনার প্রণেতারা শাসিতের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র শাসকদের উদ্দেশ্য পূরণ করেছিলেন। ন্যায্য নীতির প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ প্রকাশের অভিযোগও অসত্য। পশ্চিম জার্মানির বিভিন্ন অংশে, পোল্যান্ড, স্যাকসনীতে, উত্তর ইতালী ও অস্ট্রিয় নেদারল্যান্ডে এই নীতি অনুসরণ করা হয়নি। ন্যায্য নীতির উদ্ভাবন এবং প্রয়োগ ফ্রান্সেই উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছিল।

এটা ঠিক যে ইউরোপে জনগণকে ফিকটে (Fichte) এবং স্টেইন (Stein) যে অর্থে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন সে মুক্তি ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে হয়নি। অর্থাৎ ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের সার্বজনীন স্বীকৃতি হয়নি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে দুটি তথ্য স্মর্তব্য। প্রথমত ফ্রান্সে আবির্ভূত যে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের কূটনীতিকদের পরিচয় হয়েছিল তার ধ্বংসাত্মক রূপটি ছিল প্রবল। সুতরাং এই আদর্শের প্রতি তাদের বিরাগ ছিল স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য দেশে, যেমন স্পেন ও জার্মানিতে, জাতীয়তাবাদের আত্মপ্রকাশ ছিল অস্পষ্ট, অপূর্ণ এবং উপেক্ষণীয়। ইউরোপের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এমন কোন সংকেত ছিল না যা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে জাতীয়তাবাদ একটি স্থায়ী আদর্শে পরিণত হবে, এবং পরবর্তী প্রজন্মে ইউরোপীয় পরিবর্তন ঘটাবে। এই অতি দূরদৃষ্টি তাঁদের ছিল না বা তারা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ছিলেন না বলে ভিয়েনা-প্রণেতাদের দোষী করা যায় না। ১৮১৫ খ্রিঃ যদি তাঁরা এই অস্পষ্ট অসম্পূর্ণ আদর্শের বাস্তব রূপায়ণে সচেষ্ট হতেন তাহলে ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সংঘাত-সংঘর্ষের সৃষ্টি ছিল অবধারিত। এক প্রখর বাস্তববোধ ও সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে মেটারনিখ ও তাঁর অনুগামীরা প্রাক্‌বিপ্লব রাষ্ট্রীয় বিন্যাসের পুনঃপ্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন যাতে ইউরোপে আকাঙ্ক্ষিত শান্তি ও নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

সুতরাং য়ুট্রেক্টের সন্ধি (১৭১৩) (Utrecht) বা ভার্সাই চুক্তির (১৯১৯) তুলনায় ভিয়েনা ব্যবস্থা যে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ছিল একথা বলা যায়। তাছাড়া ভিয়েনায় যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তার অনেকগুলোই ছিল পূবনির্ধারিত। নতুন করে তার বদল না ঘটিয়ে ভিয়েনার নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক প্রজ্ঞারই পরিচয়

দিয়েছিলেন। সম্ভবত এই কারণেই ডেভিড টমসন ভিয়েনা ব্যবস্থাকে বলেছেন "Statesmanlike"। ফ্রান্সের প্রতি কোন প্রতিশোধস্পৃহাও ভিয়েনায় দেখা যায়নি। হবস্‌বম তাই ঠিকই বলেছেন যে, এটা ছিল "realistic"। এবং "Sensible"।

ভিয়েনাচুক্তি প্রণেতাদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগই গ্রাহ্য যে তাঁরা এই ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করার ব্যর্থ প্রয়াস করেছিলেন। ১৮১৫ খ্রীঃ পর অস্ট্রিয়া রাশিয়া এবং প্রাশিয়ার কালপোযোগী নীতি রচনা করার, পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যর্থতা সমালোচিত হওয়ার যোগ্য। তবু ঘড়ির কাঁটাকে পিছিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে চলে না। তাদের এই দোষে অভিযুক্ত করা সম্ভব যে তারা ঘড়ির কাঁটাগুলিকে ১৮১৫ খ্রীঃ স্তব্ধ করে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন।

১.৭ পবিত্র চুক্তি (Holy Alliance)

ভিয়েনা-পরবর্তী ইউরোপে ভিয়েনা-সম্মেলনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আরো দুটো রক্ষণশীল প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। একটি ছিল রাশিয়ার জার-এর ব্যক্তিগত উদ্যোগ—যা পবিত্র চুক্তি বা Holy Alliance নামে পরিচিত, আর একটি হল ইউরোপীয় শক্তি সমবায় বা Concert of Europe, যা মূলত ভিয়েনা সম্মেলনেরই সৃষ্টি।

পবিত্র চুক্তির উদ্ভাবক ছিলেন রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডার। মিস্টিক দার্শনিকতায় আচ্ছন্ন রুশ সম্রাট নেপোলিয়ানের পরাজয়ে ঐশী শক্তির লীলা অনুভব করেছিলেন। সুতরাং রাজনীতির সঙ্গে খ্রিস্টীয় ধর্মনীতিকে মিশিয়ে তিনি এক নতুন রাষ্ট্রনীতির স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, ফরাসি বিপ্লব ধর্মহীন, তাই তা পরাজিত। নেপোলিয়ান ধার্মিক নন, তাই তিনি নির্বাসিত। আবার ইউরোপে ধর্ম রাজনীতির খেলায় বিপর্যস্ত, তাই নেপোলিয়ানের হাতে মহাদেশ বিধ্বস্তপ্রায়। ভবিষ্যতে এ জাতীয় অঘটন যাতে না ঘটে, তার জন্য ইউরোপের রাজা বা সম্রাটদের উচিত ঐক্যবদ্ধ হয়ে সব দায়-দায়িত্ব ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রনীতি নিরূপণ করা। আলেকজান্ডার এই বিশ্বাস থেকেই 'পবিত্র চুক্তির' দলিল রচনা করিয়েছিলেন এবং বিরটেন, পোপরাজ্য ও তুরস্ক ছাড়া অন্য রাজ্যের রাজারা তাতে স্বাক্ষরও করেছিলেন।

পবিত্র চুক্তির ফলে খ্রিস্টান রাজন্যবর্গ একটি অচ্ছেদ্য ভ্রাতৃসংঘের সদস্য হয়েছিলেন এবং তাঁরা খ্রিস্টধর্মের আদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই সংঘের কোন সদস্য বিপদগ্রস্ত হলে অন্য সদস্যরা তাদের বন্ধুকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পবিত্র সংঘের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, প্রথম থেকেই এই সংঘ আলেকজান্ডার ছাড়া আর কারও সুনজরে ছিল না। তাঁর অনুরোধে যারা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন তাঁরাও এই সংঘ সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন।

মেটারনিখ একে বলেছিলেন জোরালো ফাঁকা আওয়াজ (Loud-sounding nothing) ক্যাসেলরি একে 'বিমূর্ত প্রলাপ' (A piece of sublime mysticism and nonsense) বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন, আর গেনৎস এর মধ্যে 'রঙ্গমঞ্চ অলঙ্করণ' (stage decoration) ছাড়া আর কিছুই দেখেননি। পবিত্র সংঘের ব্যর্থতা তাই ছিল অনিবার্য।

আসলে সভ্যদের আন্তরিকতার অভাব পবিত্র সংঘের ব্যর্থতার প্রধান কারণ। তাছাড়া এর অন্তর্নিহিত অর্থ সমসাময়িক উদারপন্থীদের কাছে ভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়েছিল। তারা ভেবেছিলেন, এর মাধ্যমে শক্তিধর সভ্যরা ছোট ও দুর্বল রাজ্যগুলোর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন। যেহেতু রাজা-প্রজা সকলেই ধর্মীয় নীতির ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে, তাই বড় রাজ্যগুলো ছোট রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের অধিকার রাখবে। এটাই স্বাভাবিক। ছোট রাজা ও তার প্রজা তো বড় খ্রিস্টান রাজার সন্তানতুল্য। অতএব পবিত্রচুক্তিতে আবদ্ধ বড় রাজারা ইউরোপের সব রাজ্য সম্বন্ধেই সিদ্ধান্ত নেবেন। পবিত্রচুক্তি সম্বন্ধে এই জাতীয় ভাবনাই চুক্তিটিকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সাধারণ মানুষও একে ভালো চোখে দেখেনি। কারণ, ইউরোপীয় শক্তিসমবায় ও পবিত্র চুক্তির সদস্যরা অভিন্ন হওয়ায় পবিত্র সংঘকে শক্তিসমবায়ের মতো নিপীড়ন যন্ত্রের প্রতীক হিসেবে তারা ধরে নিয়েছিল।

১.৮ ইউরোপীয় শক্তিসমবায় (Concert of Europe)

ইউরোপীয় শক্তিসমবায়ের উৎস ছিল ভিয়েনা কংগ্রেস। ঐ কংগ্রেসে উপস্থিত নেতারা তাদের কাজ সম্পন্ন করেছিলেন একটি চতুঃশক্তি চুক্তি সম্পাদন করে। অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও ব্রিটেন এই চুক্তিতে অংশ নিয়েছিল। ভবিষ্যতের বিপ্লবী অভিঘাত আর যুদ্ধের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য এই চুক্তি। এর আগে ১৮১৪ সালের মার্চ মাসে শ্যুমঁর চুক্তি (Treaty of Chaumont) করে ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া এবং রাশিয়া মৈত্রী স্থাপন করেছিল, অঙ্গীকার করেছিল এই বলে যে, নেপোলিয়ানের পতনের পরেও আন্তর্জাতিক স্থিতি বজায় রাখার স্বার্থে তারা জোটবদ্ধ থাকবে। ইউরোপীয় শক্তিসমবায় এই অঙ্গীকারেরই ফল। ১৮১৫-র ২০ নভেম্বর, যেদিন প্যারিস-এর চুক্তি দ্বিতীয় ভিয়েনা কংগ্রেসে গৃহীত হয়, সেদিনই স্বাক্ষরিত হয় চতুঃশক্তি চুক্তি, গঠিত হয় শক্তিসমবায়, যেটাকে বলা যেতে পারে প্রথম আধুনিক আন্তর্জাতিক সংস্থা।

পবিত্র চুক্তির সঙ্গে চতুঃশক্তি চুক্তির একটি মৌলিক পার্থক্য ছিল। পবিত্র চুক্তির বক্তব্য ছিল, আইনসঙ্গতভাবে যেসব রাজবংশ বিভিন্ন দেশের সিংহাসন অধিকার করে আছে, খ্রীস্টধর্মের ভিত্তিতে তারা একই দৃষ্টিভঙ্গির অংশীদার। কিন্তু চতুঃশক্তি জোটের সদস্যরা পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা, বৈচিত্র ও স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এমনকি অবস্থাভেদে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনাও তারা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে ভেবেছিলেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিযোগিতা ও অস্থিরতার মনোভাব যাতে আন্তর্জাতিক ভারসাম্য নষ্ট করে দিতে না পারে, তার ব্যবস্থাও থাকা দরকার। এই প্রয়োজনবোধই ছিল চতুঃশক্তি চুক্তি ও শক্তিসমবায়ের

ভিত্তি। ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়ে প্রতিনিধিরা প্রতিশ্রুতি দেন, শ্যুমঁ, ভিয়েনা ও প্যারিস এর চুক্তিগুলো পরবর্তী কুড়ি বছর মেনে নিয়ে তারা পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত করবেন। তাদের আশা ছিল, কূটনীতির রাশ টেনে চতুঃশক্তি চুক্তির অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলো পারস্পরিক আলোচনার মধ্য দিয়ে নিজেদের সমস্যা দূর করে মহাদেশে শান্তি বজায় রাখতে পারবে। চুক্তিতে ধর্মীয় অনুষঙ্গ না থাকায় বিভিন্ন দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গেও তার রাখা সম্ভব হবে। ব্রিটিশ সংসদের পক্ষে অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের নীতি মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু শক্তিসমবায়ের মূল নীতি 'আলোচনার মাধ্যমে সমাধান' হওয়ায় ব্রিটেনের পক্ষেও এই ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য ছিল।

সর্ব-ইউরোপীয় সমস্যাগুলো আলোচনার মাধ্যমে মেটানোর জন্য কিছুদিন পর পর বৈঠকে মিলিত হওয়া শক্তি-সমবায়ের অন্যতম শর্ত ছিল। ভিয়েনা কংগ্রেসের অল্প পরেই বসেছিল এরকম চারটি বৈঠক আয় ল্য শ্যাপেল (Aixla Chapelle) —১৮১৮; ট্রপ্পো (Troppau) ১৮২০; লাইবাখ (Laibach) —১৮২১ এবং ভেরোনা (Verona) —১৮২২।

আয় ল্য শ্যাপেল-এর বৈঠক, ১৮১৮

১৮১৮ সালের প্রথম বৈঠকটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই বৈঠকে ফ্রান্স থেকে দখলদার সৈন্য প্রত্যাহার করা হয় এবং ফ্রান্সকে পঞ্চম শক্তি হিসেবে ইউরোপীয় শক্তিসমবায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নরওয়ে ও ডেনমার্কের সঙ্গে বার্নাকোত সন্ধি অনুযায়ী আচরণ না করার অভিযোগে সুইডেনকে অভিযুক্ত করা হয় এবং তার কৈফিয়ৎ তলব করা হয়। মনাকোর শাসনকর্তাকেও এই বৈঠকে কিছু প্রশাসনিক পরামর্শ দেওয়া হয়।

কিন্তু এই বৈঠকেই শক্তিসমবায়ের অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ প্রকাশ্যে চলে আসে। রাশিয়া ভূমধ্যসাগরে নৌ-জাহাজ পাঠিয়ে বার্বারী জলদস্যুদের দমন করবার প্রস্তাব দিয়ে ব্রিটেন আপত্তি জানায়। তার আশঙ্কা ছিল এতে ভূমধ্যসাগরে রাশিয়ার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। দক্ষিণ আমেরিকার বিক্ষুব্ধ উপনিবেশ-এ সামরিক হস্তক্ষেপের স্পেনীয় সিদ্ধান্তেরও বিরোধিতা করে ব্রিটেন। ঐ অঞ্চলে তার বাণিজ্যিক প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভয়ে। আবার ব্রিটেন যখন অবৈধ দাসব্যবস্থা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সামুদ্রিক জাহাজ তল্লাসীর প্রস্তাব করে, তখন অন্য সদস্যরা তাতে বাধা দেয়। কেননা এতে ব্রিটেনের সামুদ্রিক আধিপত্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল।

ট্রপ্পোর বৈঠক, ১৮২০

ইউরোপীয় শক্তিসমবায়ের অন্তর্বিরোধ ট্রপ্পো কংগ্রেসে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৮২০ সালে নেপল্‌স্, স্পেন ও পর্তুগালে বিদ্রোহীদের চাপে শাসকগোষ্ঠী শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে বাধ্য হয়। কিন্তু এতে শক্তিসমবায়ের সদস্যরা অসন্তুষ্ট হয়। ট্রপ্পো বৈঠকে তারা বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য মিলিত হয়। মেটারনিখ-এর পরামর্শে এই বৈঠকে যে 'ট্রপ্পো প্রটোকল' রচিত হয়, তাতে বলা হয়, যদি কোন দেশ অন্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক শাসন-সংস্কার করে, তাহলে শক্তিসমবায় সেই দেশকে জোট থেকে বহিষ্কার করতে পারবে বা সেই

দেশের শাসন-সংস্কারকে বাতিল করতে পারবে এবং প্রতিসংস্কারের জন্য বলপ্রয়োগ করতে পারবে। এটা আসলে ছিল সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অতিরাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রস্তাব। ব্রিটেন ও ফ্রান্স তীব্রভাবে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এবং বৈঠক নিষ্ফল হয়।

লাইবাখ-এর বৈঠক, ১৮২১

এই বৈঠকে ইতালির ব্যাপারে অস্ট্রিয়ার স্বার্থ জড়িত, এই নীতি স্বীকার করে অস্ট্রিয়াকে নেপল্‌সের বিদ্রোহ দমনের অধিকার দেওয়া হয় এবং অস্ট্রিয়া বিদ্রোহ দমন করে ফার্দিন্যান্দকে নেপলসের সিংহাসনে বসিয়ে দেয়।

ভেরোনার বৈঠক, ১৮২২

লাইবাখে কোন বড় সংকট দেখা না দিলেও সংকট ঘনীভূত হয় ভেরোনা বেঠকে। এই বৈঠকে দুটো প্রধান সমস্যা ছিল, একটি তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রীসের বিদ্রোহ, আর অন্যটি স্পেনের গণবিদ্রোহ। অস্ট্রিয়া নেপল্‌সে হস্তক্ষেপ করেছে, এই উদাহরণ দেখিয়ে রাশিয়া এই বৈঠকে গ্রীসে অভিযানের অনুমতি চায়, আর স্পেনের রাজা সপ্তম ফার্দিনান্দের অনুরোধে ফ্রান্স স্পেনের বিদ্রোহ দমন করতে অগ্রসর হয়। ব্রিটেন দুটি ক্ষেত্রেই প্রতিবাদ করে। রাশিয়া সামরিকভাবে নিরস্ত হয়, কিন্তু স্পেনের রাজাও বুরবোঁ বংশোদ্ভূত, সুতরাং তাকে সাহায্য করা অবশ্যকর্তব্য এই অজুহাতে ফ্রান্স ব্রিটেনের বিরোধিতা সত্ত্বেও স্পেনে হস্তক্ষেপ করে। এর উত্তরে ক্যাসেলরি-র স্থলাভিষিক্ত ব্রিটিশ বিদেশ সচিব দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতা স্বীকার করে নেন এবং তার দেখাদেখি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ঐ স্বাধীনতা মেনে নেয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মনরো এই সময়েই তার বিখ্যাত 'মন্‌রো ডকট্রিন' ঘোষণা করে আমেরিকায় ইউরোপীয় হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করেন। ফলে মেটারনিখের হস্তক্ষেপ নীতি এক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়, ব্রিটেন শক্তিসমবায় থেকে সরে আসে এবং কার্যত ইউরোপীয় শক্তিসমবায় নষ্ট হয়ে যায়।

১.৯ শক্তিসমবায়ের ব্যর্থতা

আসলে ইউরোপীয় শক্তি-সমবায়ের ব্যর্থতার বীজ গোড়া থেকেই উপ্ত ছিল। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই নিজের ভূখণ্ড-অধিকার বিষয়ে নিজস্ব নীতি ও স্বার্থ সম্পর্কে সজাগ ছিল, জোট-নীতির সাফল্য তাই ছিল অনিশ্চিত। সিম্যানের মতে, সেই সময়ে 'কংগ্রেস সিস্টেম' বলে কোনকিছুর অস্তিত্ব ছিল না। ছিল না কোন চার্টার। তাছাড়া নেপোলিয়ন পতনের সময়ে দুর্ভিক্ষ ও অর্থনৈতিক মন্দার ফলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো যে সামাজিক বিপ্লবের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিল, ১৮২০-র পর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সেই ভয় থেকে তাদের মুক্তি দেয়। সুতরাং জোটবদ্ধ রক্ষণশীলতার প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায়, দেখা দেয় স্বার্থের দ্বন্দ্ব। ত্বরান্বিত হয় শক্তিসমবায়ের পতন। কিন্তু তখন একক চেষ্টায় রক্ষণশীলতার দুর্গকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন একজন। তিনি মেটারনিখ, অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর।

১.১০ মেটারনিখ ও মেটারনিখ ব্যবস্থা

মেটারনিখ ১৮০৯-১৮৪৮ সাল পর্যন্ত অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রপরিচালক ছিলেন এবং এই সময়ে শুধু অস্ট্রিয়ার নয়, ইউরোপের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক ছিলেন। তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় হিসাবে এটুকুই যথেষ্ট যে, তাঁর কর্মকুশলতার একাধিপত্যের জন্য ১৮১৫ থেকে ১৮৪৮ সালের অন্তর্বর্তী সময়ের নাম হয়েছে মেটারনিখের যুগ—Era of Metternich, তাঁর ব্যক্তিত্ব, সামাজিক সৌজন্য, কূটনীতিক ভূয়োদর্শিতা ও ক্ষমতা, লোকচরিত্র পাঠের অত্যাশ্চর্য শক্তি, জটিল রাজনৈতিক প্রশ্ন সমাধানের সহজ প্রতিভা—সব মিলে তাঁর মধ্যে এত বহুমুখী গুণের সমাবেশ হয়েছিল যে, ভিয়েনা বৈঠকে তাঁর প্রাধান্য ও পরে ইউরোপীয় ব্যাপারে তাঁর নৈতিক একাধিপত্য অস্বীকার করার কোন উপায় ছিল না। আত্মক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি ছিলেন অত্যধিক সচেতন এবং এই আত্মপ্রত্যয় শত বিঘ্ন এবং পরাজয়েও অটুট ছিল। এমনকি, ১৮৪৮-এর বিপ্লবের পর যখন অস্ট্রিয়ার সম্রাট সিংহাসনচ্যুত হন এবং মেটারনিখ ইংল্যান্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখনও তার মুখে শোনা যায়—আমার মন কখনও ভুল করেনি—'My mind has never entertained error'.

ঐতিহাসিক পুরুষ হিসেবে ফরাসি বিপ্লবকে তীব্রভাবে ঘৃণা ও অস্বীকার করার জন্যই মেটারনিখ বিখ্যাত। ফরাসি বিপ্লবকে নিজের অলঙ্কৃত ভাষার সাহায্যে যথাসাধ্য হেয় তিনি করেছেন। 'It was a disease which must be cured, the volcano which must be extinguished, the gangrene which must be burned with hot iron, the hydra with jaws open to swallow up the social order'. অর্থাৎ,—ফরাসি বিপ্লব একটা মহাব্যাধি, যার চিকিৎসার প্রয়োজন—একটি আগ্নেয়গিরি যার নির্বাপনের প্রয়োজন—একটা গলিত ক্ষত যাকে গরম লোহা দ্বারা পোড়ানো দরকার, একটা সহস্রশীর্ষ দানব যার উন্মুক্ত মুখাবিবর সামাজিক কাঠামোকে গ্রাস করতে উদ্যত। বিপ্লবের প্রতি মেটারনিখের এই অশ্রদ্ধা তাঁর সব কাজের মধ্যে প্রতিফলিত, কি অভ্যন্তরীণ নীতিতে কি পররাষ্ট্র-পরিচালন পদ্ধতিতে।

অস্ট্রিয়ার রাজতন্ত্র এবং অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বে বিশ্বাসী মেটারনিখ ইউরোপে জাতীয়তাবাদের প্রসার দমন করতে সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ভিয়েনা ব্যবস্থার স্থিতিশীলতাকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করতেন, পার্লামেন্টীয় প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থার প্রতি তাঁর গভীর ভীতি ছিল। ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখাই ছিল তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার প্রধান লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে ডেভিড টমসনের মন্তব্য : "He also had a philosophy of conservatism, a theory of how balance might be kept in Europe as a Continent....." মেটারনিখ-এর মতে, প্রতিটি দেশের মধ্যেই সমাজ-ব্যবস্থায় এক ধরনের ভারসাম্য (equilibrium) উপস্থিত থাকে, এবং সেই সামাজিক কাঠামোকে ধ্বংসাত্মক শক্তিগুলি থেকে রক্ষা করার প্রয়োজন হয়। একমাত্র সামাজিক শৃঙ্খলাই ঐ ভারসাম্যকে বজায় রাখতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যেও একটা সমতা বা ভারসাম্য রক্ষা করা দরকার, তার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের ওপর

নির্ভর না করে একটি অতিরাষ্ট্রীয় (super-national) ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করা প্রয়োজন। মেটারনিখ বিশ্বাস করতেন, ইউরোপীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত।

মেটারনিখের বহু প্রচারিত 'সিস্টেম' বা 'ব্যবস্থা' তৈরি হয়েছিল অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের জাতিগত এবং অন্যান্য অনৈক্যের সুযোগ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে। হ্যাপস্‌বার্গ সম্রাটের বহু পুরাতন 'divide and rule' নীতিকে তিনি প্রয়োগ করেছিলেন। এবং তাঁর ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা হয়েছিল বেহেমিয়াতে জার্মান সৈন্যবাহিনী এবং লম্বার্ডিতে হাঙ্গেরিয়ান সেনা উপস্থিত রেখে। তাঁর 'সিস্টেম' জার্মানিকে একটি দুর্বল ও শিথিল রাষ্ট্রসংঘে পরিণত করে রেখেছিল যাতে জার্মান ডায়েট (Diet, সংসদ) অস্ট্রিয়ার নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে। সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা দিয়ে তিনি অস্ট্রিয়াকে বেঁধে রেখেছিলেন। গুপ্তচর ছাড়ানো ছিল, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছিল, বিদেশী বই নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, ছাত্র ও অধ্যাপকদের ওপর সরকারের তরফ থেকে কড়া নজর রাখা হয়েছিল। পুলিশের হাতে ছিল বিশেষ ক্ষমতা। অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার ভিয়েনাতে একটি বিশেষ দপ্তর বসিয়েছিলেন, সেখানে বিদেশী চিঠিপত্র খুলে দেখে, তার অর্থ অনুধাবন করে, সন্দেহজনক তথ্য চ্যান্সেলারের অফিসে পাঠিয়ে দিয়ে, তারপর আবার সেগুলি ঠিকমত বন্ধ করে যথাস্থানে পাঠানো হতো। ফলে মেটারনিখ ইউরোপের বিভিন্ন প্রশাসনিক গোপন কথা জানতে পারতেন, দেশে দেশে তাঁর অনেক গুপ্তচর উপস্থিত থাকত যারা তাকে সরাসরি খবর পাঠাত।

মেটারনিখ ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য ছিল জার্মানি। সময়টি ছিল জার্মানিতে রোমান্টিক চেতনার যুগ। যদিও কোন সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলন উনিশ শতকের প্রথমে জার্মানিতে গড়ে ওঠেনি, কিন্তু শিক্ষিত জার্মানদের ভাবজগতে রোমান্টিক আলোড়ন দেখা দিয়েছিল। ঐ আন্দোলনের পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন, আন্তর্জাতিকতা এবং সার্বজনীনতার পরিবর্তে তাঁরা উপাসনা করেছিলেন জাতীয় সংস্কৃতির। ফ্রাইডরিখ শ্লেগেল এবং ফ্রাইডরিখ নেভোলিশ রক্ষণশীলতার প্রতিনিধি হয়েও জার্মানজাতির অতীতের কথা প্রচার করেছিলেন। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উদারনীতির প্রচার ও প্রসার। সৃষ্টি হয়েছিল বিদ্রোহী কিছু ছাত্র সংগঠন বা বার্শেনস্কাফ্‌টেন (Burchenschaften)। জেলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ওয়ার্টবুর্গ উৎসব করেছিল, যেখানে তারা 'লাইপজিগ'-এর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয় এবং 'রিফর্মেশন' বা প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম-আন্দোলনের ত্রিশতবর্ষ-পূর্তি উৎসব পালন করেছিল। দুটি ঘটনাই স্বৈরাচার বিরোধী। এর সঙ্গে যুক্ত হয় কট্‌জ্‌ব্যু হত্যাকাণ্ড। কট্‌জ্‌ব্যু (Kotzebue) ছিলেন এক প্রতিক্রিয়াশীল সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ওপর তাঁর আক্রমণ জার্মান লিবারেলদের অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এই ব্যক্তিকে ১৮১৯-এ হত্যা করা হয়েছিল। এই পটভূমিকাতেই মেটারনিখ সুচতুরভাবে তাঁর 'কার্লস্‌বাড্‌ ঘোষণা' জার্মানিতে প্রয়োগ করেন।

ভিয়েনা চুক্তি জার্মানিতে অস্ট্রিয়ার আধিপত্যকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। নেপোলিয়ন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যকে ভেঙে দিয়ে রাইন-এর রাজ্যসঙ্ঘ গঠন করেছিলেন, এবং তাঁর পতনের পরে ভিয়েনা কংগ্রেস-এর নেতারা সৃষ্টি করেছিল জার্মান কনফেডারেশন। কনফেডারেশন-এর সাংবিধানিক আইনে (Act of Confederation) বলা

হয়েছিল, এর উদ্দেশ্য হবে জার্মানির অভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিধান করা এবং জার্মান রাজ্যসমষ্টির স্বাধীনতা রক্ষা করা। জার্মান রাজ্যগুলি নানা সমস্যায় একজোটে কাজ করবে সে কথাও বলা হয়েছিল। এই কনফেডারেশনের রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি দ্বিকক্ষযুক্ত ডায়েট (Diet) (পার্লামেন্ট-এর সমতুল্য) গঠিত হয়েছিল যার বৃহত্তর কক্ষে রাজ্যগুলিরই ন্যূনতম একজন (কোন কোন রাজ্যের ৩-৪টি) প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে সাধারণ সমস্যাগুলি সম্বন্ধে ভোট দিতেন। এই প্রতিনিধিরা কিন্তু শাসকদের মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন; জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নয়। এই ডায়েট স্বাধীন এবং কার্যকর একটি প্রশাসনিক সংস্থায় রূপান্তরিত হতে না পারায় ক্রমশ মেটারনিখের অনুশাসন এবং তাঁর তত্ত্বাবধান মেনে নিয়েছিল, আর তাঁর নির্দেশিত পথেই লিবারেল বা উদারপন্থী জার্মানদের আক্রমণ থেকে জার্মানিকে বাঁচাবার কাজে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিল। একটি দুর্বল প্রশাসনিক সংস্থাকে সহজেই অস্ট্রিয়ান চ্যান্সেলার নিজের দপ্তরে রূপান্তরিত করেছিলেন। ওয়ার্টবুর্গ উৎসব এবং কট্‌জব্যু হত্যাকাণ্ডের পরে অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার তাঁর প্রচারের দ্বারা জার্মানির শাসকদের উদারনীতির পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে সহজেই সন্দিহান করে তোলেন, এবং শীঘ্রই ঐ দুর্বল জার্মান ডায়েটের মাধ্যমে তাঁর উদ্ভাবিত কার্লস্‌বাড্‌ ডিক্রি জারী করেন (১৮১৯)।

১৮১৯-এ ফেডারেল ডায়েট-এ গৃহীত কার্লস্‌বাড্‌ ঘোষণা জার্মান কনফেডারেশন-এ এক চরম রক্ষণশীলতা প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই ঘোষণা ছাত্র-সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে জার্মান শাসকদের কঠোর ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেয়, এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করা আর সবরকম প্রকাশনা সেনসর করার ক্ষমতা দেয়। রাজনৈতিক গুপ্ত সংগঠনগুলি সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমিশনও কার্লস্‌বাড্‌ ঘোষণা অনুযায়ী গঠন করা হয়। প্রদেশীয় পার্লামেন্টগুলির ক্ষমতাও সঙ্কুচিত হয় এবং জার্মান রাজ্যগুলি তাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ডায়েট-এর হস্তক্ষেপের অধিকার স্বীকার করে নেয়।

মেটারনিখের ক্রিয়াকলাপ এই সময়কার 'কনসার্ট অফ ইউরোপ'কেও প্রভাবিত করেছিল। এই রাষ্ট্রজোটের কাছে প্রধানত মেটারনিখের চেষ্টায় গণবিপ্লব-বিরোধী নীতি অনুমোদিত হয়। অর্থাৎ, কোন রাজ্যে গণবিপ্লব ঘটলে শক্তিসমবায় যৌথভাবে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করবে, এই নীতি ইউরোপের প্রধান চতুঃশক্তি (অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া, ইংল্যান্ড) বাহ্যত মেনে নিয়েছিল। যদিও ব্রিটেনের এই হস্তক্ষেপ নীতিতে সমর্থন ছিল না। কিন্তু ট্রপ্পো কংগ্রেস এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং ঐ কংগ্রেসে রুশ সম্রাট আলেকজান্ডার এবং মেটারনিখ একমত হয়ে কংগ্রেসের তরফ থেকে বিভিন্ন দেশে গণবিদ্রোহের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপনীতি ঘোষণা করেছিলেন। ট্রপ্পো কংগ্রেসে গৃহীত ট্রপ্পো প্রটোকল-এর ঘোষণা অনুসরণ করেই মেটারনিখ ১৮২০-২১ খ্রিস্টাব্দে ইতালির নেপল্‌স্‌ এবং পিডমন্টে গণবিদ্রোহগুলি সৈন্য পাঠিয়ে দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তবে মেটারনিখের ব্যবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এর প্রতিক্রিয়াও ছিল তীব্র। প্রথম প্রতিক্রিয়া দেখা যায় ইতালিতে। নেপোলিয়ান বোনাপার্টের উন্নত শাসনব্যবস্থার সঙ্গে দীর্ঘকাল পরিচিত থাকার দরুন ইতালির

অধিবাসীরা মেটারনিখের শাসন তীব্রভাবে অপছন্দ করেছিলেন। ইতালিতে মধ্যবিত্তশ্রেণী পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক প্রশাসন এবং সামাজিক কাঠামোকে স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না। তাই তারা মেটারনিখকে মেনে নেয়নি। এমনকি পোপ এবং পিডমন্ট সার্ডিনিয়ার শাসকরাও সুযোগ পেলেই মেটারনিখের বিরোধিতা করেছেন। ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিশেষ পরিবর্তন এসেছিল দুটি ব্যাপারে—গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও তার সাফল্য, এবং জার্মানিতে 'জোলভেরেন'-এর প্রতিষ্ঠা, ও ১৮৩৪ নাগাদ তার পূর্ণতা লাভ। এই ঘটনাগুলির সঙ্গে বেলজিয়ামের হল্যান্ড থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং নরওয়ে রাজ্যটির স্বাশাসনের দিকে অগ্রগতি ও জাতীয়তাবাদী আবহ তৈরি হওয়ার ব্যাপারগুলি যুক্ত করে বলা যায়, ১৮৩০ নাগাদই মেটারনিখ ব্যবস্থার নানাস্থানে ফাটল ধরেছিল।

১৮৩০-এ এবং ১৮৪৬-এ অস্ট্রিয়া অধিকৃত পোল্যান্ডে তীব্র কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছিল এবং অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার তাঁর চিরাচরিত পদ্ধতিতে সেই বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। কিন্তু তবুও ১৮৪৬-এর ঐ বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে অস্ট্রিয়ার প্রশাসন বহু ঘৃণিত রোবট বা শ্রমকর অস্ট্রিয়া অধিকৃত পোল্যন্ডের গ্যালিসিয়া প্রদেশে নিষিদ্ধ করে। পরে সমগ্র অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যে শ্রমকর বাতিল করতে বাধ্য হয় (Act of Emancipation, 1848)। ১৮৪৮-এর বিপ্লবে মেটারনিখ ব্যবস্থা তাসের বাড়ির মতন ভেঙে পড়ে।

দীর্ঘকাল ইউরোপীয় শান্তি অব্যাহত রাখতে পারলেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মেটারনিখ উচ্চস্তরের রাজনীতিকুশলী ছিলেন না। তাঁর মধ্যে অভাব ছিল দূরদর্শী প্রতিভার। তাঁর নীতি সুবিধাবাদ ও নেতিবাদের সংমিশ্রণ; সংগঠনী কুশলতার অভাব তাঁর মধ্যে যথেষ্ট ছিল, ফরাসি বিপ্লবের ধ্বংসকেই তিনি লক্ষ্য করেছেন, তার সৃষ্টি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। দুই যুগের সন্ধিস্থলে তাঁর আবির্ভাব—অপসৃয়মাণ যুগকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি, আবার আগত যুগকেও গ্রহণ করতে পারেনি। এই দুই যুগের স্বীকৃতি অস্বীকৃতির মধ্যেই আছে মেটারনিখ জীবনের ট্র্যাজেডি। এই বিষয়ে তাঁর নিজস্ব স্বীকৃতি উল্লেখযোগ্য—"I have come into the world either too early or too late. Earlier I should have enjoyed the age, later I should have helped to reconstruct it. Today I have to give my life to propping up mouldering institutions." 'এই জগতে আমার কিছু আগে বা কিছু পরে আসা উচিত ছিল। আগে আসতে পারলে যুগকে উপভোগ করতে পারতাম, পরে এলেও এই জগতের পুনর্গঠনে সহায়ক হতাম। আজ ক্ষয়িষ্ণু প্রতিষ্ঠানগুলো খাড়া রাখবার জন্য আমার জীবনপাত করতে হচ্ছে।'

১.১১ সারসংক্ষেপ

নেপোলিয়ানের পরাজয়ের পর ইউরোপের প্রধান ফ্রান্সবিরোধী দেশগুলো নেপোলিয়ানের তৈরি রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে প্রাক্-বিপ্লব রক্ষণশীল কাঠামো ফিরিয়ে আনবার জন্য এবং তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় মিলিত হয়। বৈঠক চলে ১৮১৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে

১৮১৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত। সম্মেলনের শেষে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তাতে অস্ট্রিয়া, ব্রিটেন, এশিয়া ও রাশিয়ার স্বার্থই প্রধানত রক্ষিত হয়। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য ও জাতীয়তাবাদের শিক্ষা উপেক্ষিত হয়। ভিয়েনা কংগ্রেসের প্রধান ব্যক্তিত্ব, অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর, মেটারনিখ জানতেন, ভিয়েনা ব্যবস্থা সত্ত্বেও দেশে বিপ্লবী ঢেউ-এর সম্ভাবনা থেকে গিয়েছিল এবং ইউরোপীয় শাসকগোষ্ঠীর মধ্যেও বিবাদ অবশ্যম্ভাবী ছিল। সুতরাং আন্তর্জাতিক অন্তর্বিরোধ যাতে যুদ্ধ ও বিপ্লবে পরিণতি লাভ না করে, ভিয়েনা ব্যবস্থা যাতে অন্তত কয়েকবছর অক্ষুণ্ণ থাকে, তার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের কথা তিনি ভেবেছিলেন। চতুঃশক্তি চুক্তিতে প্রস্তাবিত ইউরোপীয় শক্তিসমবায়কে এই ধরনের সংগঠনে পরিণত করেন তিনি। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী বৃহৎ শক্তিবর্গের চারটি বৈঠক আহূত হয়। বৈঠকের মাধ্যমে মহাদেশীয় নজরদারির এই জোটবদ্ধ প্রয়াসই ইতিহাসে 'কংগ্রেস সিস্টেম' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এর সঙ্গে ১৮৩০-এর দশক পর্যন্ত যুক্ত ছিল মেটারনিখের নিজস্ব ব্যবস্থা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভিয়েনা ব্যবস্থা, শক্তিসমবায় এবং মেটারনিখ ব্যবস্থা—সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল।

১.১৩ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন :

১। ভিয়েনা সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল? এই সম্মেলনে কী কী প্রধান সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল?

২। ভিয়েনা চুক্তি কি শুধুই কূটনৈতিক দরাদরি ছিল? একে কি কোন অর্থেই 'reasonable' এবং 'statesmanlike' বলা যায় না?

৩। পবিত্র চুক্তি ও পবিত্র সংঘের মূল নীতি কি ছিল? চতুঃশক্তি চুক্তির সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায়?

৪। ইউরোপীয় শক্তিসমবায়ের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করুন। এই সংঘ কতদূর সফল হয়েছিল?

৫। মেটারনিখের রাজনৈতিক দর্শন কি ছিল? মেটারনিখ ব্যবস্থার মূল্যায়ন করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। ভিয়েনা সম্মেলনের নেতৃত্ব কোন কোন দেশের হাতে ন্যস্ত ছিল?

২। জার প্রথম আলেকজান্ডারকে মেটারনিখ 'mind man' বলেছিলেন কেন?

৩। 'Principle of Legitimacy'-র অর্থ কি?

৪। 'পবিত্র চুক্তি' সম্পর্কে মেটারনিখ কি মন্তব্য করেছিলেন?

৫। কোন কোন রাষ্ট্র চতুঃশক্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল?

৬। ইউরোপীয় শক্তিসমবায়ের মোট কটি বৈঠক কোথায় কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

৭। নেপল্‌স্-এর বিদ্রোহ কীভাবে দমন করা হয়?

৮। 'মনরো ডকট্রিন' কি?

৯। 'My mind has never entertained error', কী প্রসঙ্গে কে এই কথা বলেছিলেন?

১০। 'কার্লস্‌বাড্‌ ঘোষণা' ব্যাখ্যা করুন।

১.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

১। E. J. Hobsbawm : The Age of Revolution.

২। David Thomson : Europe Since Napoleon.

৩। D. C. B Seaman : From Vienna to Versailles.

৪। G. Rude : Revolutionary Europe

৫। Norman Davies : Europe

৭। প্রফুল্ল চক্রবর্তী : য়োরোপের ইতিহাস

৮। চিত্র অধিকারী : আধুনিক ইউরোপ—বিন্যাস ও বিবর্তন।

একক ২ □ ১৮৩০ ও ১৮৪৮-এর বিপ্লব

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ ফ্রান্সের জুলাই (১৮৩০) বিপ্লবের কারণ

২.৪ ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের ফলাফল

২.৫ ইউরোপের অন্যান্য দেশে জুলাই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া

২.৬ মধ্য ইউরোপে জুলাই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া

২.৭ ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পটভূমি

২.৮ ১৮৪৮-এর বিভিন্ন বিপ্লবের প্রকৃতি

২.৯ সারসংক্ষেপ

২.১০ অনুশীলনী

২.১১ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য

আগের এককটিতে নেপোলিয়ন-যুগের পরবর্তী ইউরোপীয় রক্ষণশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন, কিভাবে দুটি পর্যায়ে, পৃথক পৃথক বিপ্লবের ধাক্কায় সেই রক্ষণশীল ব্যবস্থা আবার ভেঙে পড়েছিল।

২.২ প্রস্তাবনা

উনিশ শতকের ইউরোপের ইতিহাসের মূল সুর ছিল দুই স্বতঃবিরোধী মতবাদের সংঘাত—একদিকে সাম্য ও জাতীয়তাবাদ (equality and nationalism)। আর অন্যদিকে স্বৈরাচার, রক্ষণশীলতা আর বৈধাধিকারবাদ (autocracy, conservatism, legitimacy)। এই দুই মতের দ্বন্দ্ব ১৮১৫ থেকে ১৮৪৮ পর্যন্ত

নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছিল। তবে এর মধ্যে রক্ষণশীলতা ও পরিবর্তনের মাপকাঠিতে বিচার করে দুটি প্রধান পর্বকে চিহ্নিত করা যায়। ১৮১৫-১৮৩০, এই সময়টি হল রক্ষণশীলতার যুগ। আর ১৮৩০-১৮৪৮, এই সময়টি হল পরিবর্তনের যুগ। ১৮৩০ সাল পর্যন্ত ইউরোপের স্বৈরাচারী শাসকরা একজোট হয়ে সামাজিক বিদ্রোহ ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। এই সময়কে তাই বলা হয় রক্ষণশীলতার যুগ। কিন্তু বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত ঠেকানো যায়নি। ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লবের পর থেকে ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি বিপ্লব পর্যন্ত ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানি, ইতালি, সুইজারল্যান্ড, পোল্যান্ড প্রভৃতি দেশে একের এক বিপ্লব সংঘটিত হতে থাকে। এই যুগটিকে তাই বলা যেতে পারে বিপ্লবের যুগ। রক্ষণশীলতার যুগ থেকে বিপ্লবের যুগে এই উত্তরণের বিষয়টিই বর্তমান এককের আলোচ্য।

২.৩ ফ্রান্সের জুলাই (১৮৩০) বিপ্লবের কারণ

প্রতি-বিপ্লবী রাষ্ট্রব্যবস্থা আর বিপ্লবী ধারণার সংঘাতকেই ১৮৩০-এর বিপ্লবের প্রধান কারণ বলা যেতে পারে। আর এই সংঘাতের তীব্রতাবৃদ্ধির কারণ হিসেবে দেখানো যেতে পারে ১৮১৫-১৮৩০-এর ফরাসি রাজতন্ত্রের দুমুখী প্রবণতার দ্বন্দ্বকে।

১৮১৫ থেকে ১৮২৪ পর্যন্ত ফরাসি সিংহাসনে ছিলেন অষ্টাদশ লুই। ভিয়েনা ব্যবস্থার বৈধ অধিকার-এর নীতির ভিত্তিতে বুরবোঁ বংশের এই রাজা সিংহাসনে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি মেটারনিখের মতো বা রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডারের মতো অন্ধ প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন না। কঠোর প্রতিবিপ্লবী ব্যবস্থা স্থাপন বা চতুর্দশ লুই-এর চরম একনায়কতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আর যে ফ্রান্সে সম্ভব নয়, একথা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি প্রশাসনিক সনদ অনুমোদন করে, নির্বাচিত প্রতিনিধিসভা মেনে নিয়ে, ব্যক্তিগত সাম্য, ধর্মের স্বাধীনতা আর সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকার করে উদার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। স্বভাবতই উগ্র রাজতন্ত্রীরা এতে খুশী হয়নি। দক্ষিণ প্রান্তে তারা অচিরেই দাঙ্গা বাধিয়েছিল, যা White Terror বা শ্বেত সন্ত্রাস নামে খ্যাত। এই সময়েই নিহত হয়েছিলেন নেপোলিয়ানের একসময়ের সহকারী 'নে' (Ney) এবং ফরাসি সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী দ্যুক দ্য বারি (Duc de Berry)। পরিস্থিতির চাপে অষ্টাদশ লুই উদার রাজতন্ত্রের আদর্শ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই যেটুকু রাজকীয় উদারতার সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল, তাতেই ফরাসি বুর্জোয়া নেতৃত্ব আবার নিজেদের সংগঠন বাড়িয়ে নিয়ে ফরাসি জনগণকে আবার বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত করতে পেরেছিল। যেহেতু সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা একটুও কমেনি, তাই বিদ্রোহ তাদের কাছে আকাঙ্ক্ষিতই ছিল।

এই অবস্থায় সিংহাসনে এসেছিলেন দশম চার্লস। তিনি ছিলেন উগ্র রাজপন্থীদের নেতা, সুতরাং তাঁর আমলে অষ্টাদশ লুই-এর বিপরীত প্রবণতা দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। তিনি ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্ব করে জেসুইটদের ফিরিয়ে এনেছিলেন এবং ধর্মীয় সমালোচনা বন্ধ করবার জন্য আইন পাশ করেছিলেন। চার্চ ও অভিজাতদের সব সুযোগ

সুবিধে তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ফ্রান্সকে যাজকদের সাহায্যে শাসন করতে চেয়েছিলেন। এই কারণে তাঁর সরকারকে বলা হত, 'Government by Priests, through Priests, for Priests'। সব সংস্কারের বিরোধী ছিলেন দশম চার্লস। তাঁর রাজত্বকালে মাতিনিয়াক (Martignac), পলিনিয়াক (Polignac) প্রভৃতির নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রীসভাগুলির চরিত্রও ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। সুতরাং বুর্জোয়াদের সঙ্গে এই রাজতন্ত্রের লড়াই ছিল অনিবার্য।

এই অবস্থায় ফ্রান্সে ১৮৩০ সালে উদার বুর্জোয়া গোষ্ঠী সংসদে গরিষ্ঠতা অর্জন করে রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু রাজা দশম চার্লসকে বশে আনতে না পারায় সেখানে বৈপ্লবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়।

দশম চার্লস নতি স্বীকার করেননি, কুদেতার পথ বেছে নিয়েছিলেন। তিনি ১৮৩০-এর ২৬শে জুলাই চারটি অর্ডিনান্স জারি করেন : (১) সংসদ আবার ভেঙে দেওয়া হয়। (২) সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা বিলোপ করা হয়। (৩) সংশোধিত নির্বাচনী আইনে নির্বাচকদের সংখ্যা তিন-চতুর্থাংশ কমিয়ে নামিয়ে আনা হয় ২৫০০০-এ এবং (৪) নতুন নির্বাচনের একটি দিন স্থির করা হয়।

অর্ডিনান্সের প্রতিবাদে মুদ্রক ও সাংবাদিকদের ধর্মঘটের সঙ্গে সঙ্গে প্যারিসের সর্বত্র ব্যারিকেড তৈরি করা হয় এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে। তিনদিন লড়াইয়ের পর (Lestrois glorieuses, July 27-29, তিনটি গৌরবময় দিন, জুলাই ২৭-২৯) প্যারিসের বিপ্লবীরা বিজয়ী হয়। পরিস্থিতি যে এমন বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে চার্লস তা একেবারেই বুঝতে পারেননি এবং সম্ভাব্য বিপ্লবী অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে কোন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি। যখন অনেক সাংবিধানিক সুযোগ সুবিধা ফিরিয়ে দিয়ে তিনি তাঁর সিংহাসন রাখতে চাইলেন তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর পৌত্র দ্যুক দ্য বর্দোর (Duc de Bordeaux) অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই প্যারিসে এই রাজবংশের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। প্যারিস লুই ফিলিপ 'দ্যুক দলেয়াঁর' (Louis Philppe, Duc D'orleans) হাতে সিংহাসন তুলে দিয়েছে।

২.৪ ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের ফলাফল

দ্য তকভিল (De Tocquville) লিখেছেন, জুলাই বিপ্লবের ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে চলে যায়। লুই ফিলিপকে রাজমুকুট দেওয়ার আগে সনদের সংশোধন করে, এই শ্রেণী নিজস্ব স্বার্থরক্ষার সুদৃঢ় ব্যবস্থা করেছিল। পুরনো সনদের ভূমিকাটি বাদ দিয়ে ঐশী রাজতন্ত্রের ধারণাকে অস্বীকার করা হয়। রাজার অর্ডিনান্স ঘোষণার ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে, উচ্চতর কক্ষের বিশেষ ক্ষমতা বাতিল করা হয়; ভোটাধিকার কিছুটা প্রসারিত করার ফলে বুর্জোয়াশ্রেণীর অধিকাংশ মানুষ ভোটাধিকার পায়। রাজার উপাধির (title) পরিবর্তন করা হয়। এখন থেকে রাজার উপাধি হয় "King of the French" বা ফরাসিদের রাজা, আগেকার উপাধি ছিল King of France বা ফ্রান্সের রাজা। বুরবোঁদের শ্বেত পতাকার পরিবর্তে ফরাসী বিপ্লবের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাকে জাতীয় পতাকার মর্যাদা দেওয়া হয়।

এই বিপ্লব চার্চ ও অভিজাত শ্রেণীকে প্রচণ্ড আঘাত করে। যাজকদের কাছ থেকে শিক্ষাব্যবস্থা কেড়ে নিয়ে, শিক্ষাকে ধর্মনিরপেক্ষ ঘোষণা করা হয়। বিপ্লবের ফলে অভিজাত শ্রেণী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়।

২.৫ ইউরোপের অন্যান্য দেশে জুলাই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া

প্যারিসের জুলাই বিপ্লবের প্রভাব ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বেলজিয়াম, সুইটজারল্যান্ড, পর্তুগাল, স্পেন, জার্মানি, ইতালি ও পোল্যান্ডে এই বিপ্লবের প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। এমনকি ব্রিটেনেও এই বিপ্লবের উত্তাপ অনুভূত হয়েছিল।

বেলজিয়ামের স্বাধীনতার যুদ্ধ

১৮১৫-তে বেলজিয়ামকে হল্যান্ড-এর সঙ্গে জোর করে যুক্ত করা হয়েছিল। এই সময় থেকে দক্ষিণ নেদারল্যান্ড অর্থাৎ বেলজিয়ামের রোমান ক্যাথলিক ফরাসি ও ফ্লেমিস অধিবাসীদের মনে ওলন্দাজ আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জমে উঠেছিল। দক্ষিণ ও উত্তর নেদারল্যান্ডের উদ্বর্তনের ইতিহাসও আলাদা। এই দুই অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষা ও ধর্ম আলাদা। আর্থনীতিক ক্ষেত্রেও এদের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী। কৃষি ও বাণিজ্য ওলন্দাজদের প্রধান জীবিকা। এরা অবাধ বাণিজ্যে বিশ্বাসী। অন্যদিকে বেলজিয়াম দ্রুত শিল্পায়িত হচ্ছিল এবং বেলজিয়ামের শিল্পপতিরা শুল্ক সংরক্ষণ চেয়েছিল। বেলজিয়ামকে হল্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত করে ভিয়েনা শক্তিবর্গ বেলজিয়ামের ক্যাথলিক যাজক, নির্মাতা সম্প্রদায়, ইতিহাস সচেতন বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য গোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে। সংযুক্ত রাষ্ট্রে বেলজিয়ানদের সংখ্যা ছিল ওলন্দাজদের দ্বিগুণ। কিন্তু স্টেট্স জেনারেলে ওলন্দাজ ও বেলজিয়ানদের প্রতিনিধি ছিল সমসংখ্যক। দেশের প্রশাসনে ওলন্দাজ কর্মচারীদের আধিপত্য ছিল এবং সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ওলন্দাজদের স্বার্থরক্ষা। এই থেকেই বেলজিয়ানদের মুক্তপন্থী বিরোধিতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছিল রাজা প্রথম উইলিয়ামের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী ক্ষোভ।

১৮৩০ সালের উৎপাদন সংকট আগুনে ঘৃতাহুতি দেয়। এই সময়ে আসে ফরাসি বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ। ফলে দাবানলের মত বেড়ে ওঠে বেলজিয়ামের স্বাধীনতা যুদ্ধ। অবশেষে ১৮৩৯ সালে বৃহৎ শক্তিবর্গ একটি চুক্তির দ্বারা বেলজিয়ামকে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করতে বাধ্য হয়।

২.৬ মধ্য ইউরোপের জুলাই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া

সুইটজারল্যান্ড : জুলাই বিপ্লবের পর সুইটজারল্যান্ডের ২২টি ক্যান্টনকে বিপ্লবী আবেগ স্পর্শ করেছিল। এইসব ক্যান্টনের সরকারসমূহের অধিকাংশই ১৮২৫ পর্যন্ত রক্ষণশীল অভিজাতদের হাতে ছিল। ১৮২৫-এর পর কয়েকটি ক্যান্টনে মুক্তপন্থী গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্তিত হয়। জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে ১৮৩০ থেকে ১৮৩৩-এর মধ্যে অবশিষ্ট ক্যান্টনসমূহে গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্তিত হয়।

জার্মানি : জার্মান কনফেডারেশনে ও এই সময়ে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ব্রনসত্বিকের ডিউক বিতাড়িত হন এবং তাঁর উত্তরাধিকারী একটি মুক্তিপন্থী সংবিধান প্রবর্তন করতে বাধ্য হন। হ্যানোভার, স্যাক্সনি ও হেসে-কাসেলে ও শাসকদের কাছ থেকে অনুরূপ সুবিধা আদায় করা হয়। ব্যাভারিয়া, ব্যাডেন ও হবুরটেমবুর্গে মুক্তপন্থী দলগুলির শক্তিবৃদ্ধি হয়।

ইতালি : ইতালিতে একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী অভ্যুত্থান শুরু হয়। ১৮৩০-এ বিদ্রোহের ফলে মডেনার চতুর্থ ফ্রান্সিস বিতাড়িত হন। এই বিদ্রোহের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পার্মার মারি লুইসকে ও দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়। এ্যাপেনাইন পর্বতমালার পূর্বদিকে পোপের রাজ্যে বিদ্রোহের ফলে একটি অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

পোল্যান্ড : ১৮৩০-এর নভেম্বরের শেষভাগে পোল্যান্ডে অভ্যুত্থান শুরু হয়। বিদ্রোহীরা একটি অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করে এবং জারের কাছে সংস্কার দাবি করে।

স্পেন ও পর্তুগাল : স্পেন ও পর্তুগালে সাংবিধানিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এ সময়ে প্রতিবিপ্লবী আক্রমণ এসেছিল এই দুই দেশের সিংহাসনের দুই দাবিদারের কাছ থেকে। শেষ পর্যন্ত এই দুই দেশের নিয়মতান্ত্রিক রাজার পক্ষে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের হস্তক্ষেপের ফলে সাংবিধানিক ব্যবস্থা রক্ষা পায়।

গ্রেট ব্রিটেন : এইসব ইউরোপীয় অভ্যুত্থানের বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়া ছিল ১৮৩২-এর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সংস্কার আইন। এই আইনের দ্বারা ভোটাধিকার সম্প্রসারিত করা হয় এবং বিভিন্ন নির্বাচন কেন্দ্রের শক্তির পুনর্বণ্টন করা হয়। ফলে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ব্যাপকতর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক সংস্কারের পথ প্রশস্ত হয়।

২.৭ ১৮৪৮ সালে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পটভূমি

১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফ্রান্সে দ্বিতীয়বার বিপ্লব ঘটে। প্রাক্-মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তার প্রসার, বুর্জোয়া শ্রেণীর অসন্তুষ্টি, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ক্লেশ ও সর্বোপরি ১৮৪৭-৪৮-এ উৎপাদন সংকট এই বিপ্লব ও দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের জন্ম দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে গোটা ইউরোপে। জার্মানিতে ঝিমিয়ে পড়া জাতীয়তাবাদী লড়াই নতুন করে শুরু হয়। ইতালিতে কারবোনারি গোষ্ঠীর সক্রিয় সদস্য 'ইয়ং ইতালি, ও 'ইয়ং ইউরোপ' আন্দোলনের উদগাতা মাৎসিন্নি ইতালির জাতীয় নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন। পোল্যান্ড ও সুইটজারল্যান্ডেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। আপাত ব্যর্থতা সত্ত্বেও এইসব আন্দোলন যুগ পরিবর্তনের সূচনা করে। এমনকি অস্ট্রিয় সাম্রাজ্যও এই ধাক্কা থেকে রেহাই পায়নি। রাজনৈতিক বিপ্লব থেকেই জন্ম নেয় সামাজিক অভ্যুত্থান। ইংল্যান্ডের চার্টিস্ট আন্দোলন ও তার পরবর্তী পর্যায় এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

সুতরাং ১৮১৫ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত সময়টি আসলে ছিল রক্ষণশীলতার অস্তিত্বরক্ষার প্রয়াস ও তার ব্যর্থতার যুগ আর ১৮৩০—১৮৪৮ সাল ছিলো সর্ব অর্থেই বিপ্লবের ও পরিবর্তনের যুগ। ব্যাপকতর অর্থে তাই ১৮১৫ থেকে ১৮৪৮ সাল এই পুরো সময়টিকেই বিপ্লবের বা পরিবর্তনের যুগ বলা যেতে পারে।

১৮৪৮-এ দ্রুত বিপ্লব সংগঠনের পেছনে শ্রমিকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো। এ যুগে আলসাস, নর্মান্ডি লিয়ঁ, লোয়ার উপত্যকা ও লোরেনে শিল্পায়নের ফলে ফ্রান্সে একটি শ্রমিকশ্রেণী গড়ে উঠেছিলো। এই শ্রেণী জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও কর্মক্ষেত্রে উন্নততর পরিবেশের জন্য সংগ্রামে প্রস্তুত ছিল। অথচ সরকার শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে কোন হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণ করেছিল। ১৮৪১-এ সরকার একটিমাত্র কারখানা আইন প্রণয়ন করে কিন্তু তাও কার্যকর হয়নি। সেঁ সিমঁ, ফরিয়ের প্রমুখের প্রাক্-মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা এ-যুগের ফ্রান্সে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই পরিস্থিতিতেই দেখা দেয় ১৮৪৬-এর অর্থনৈতিক সংকট।

গোটা উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপব্যাপী গম ও আলুর অজন্মা ও শিল্পে মন্দা থেকে এই সংকটের উদ্ভব ঘটে। অতিরিক্ত ফাটকাবাজি এই আর্থিক সংকট বাড়িয়ে দেয়, সর্বত্র অসন্তোষ দেখা দেয়। এই অসন্তোষ অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে উচ্চমহলের দুর্নীতি ও বিদেশনীতির ব্যর্থতার জন্য। ১৮৪০-এ তিয়ের (Thiers) মন্ত্রীসভার যুগে যে ইঙ্গ-ফরাসী আঁতাত গড়ে উঠেছিল, পূর্বাঞ্চলীয় সমস্যার সংকটে তা বিনষ্ট হয়। আশ্রিত আরব জাতীয়তাবাদী নেতা মহম্মদ আলিকে সমর্থন করে ফরাসী সরকার ইউরোপীয় শক্তি সমবায়ে ভাঙন নিয়ে আসে। পূর্বাঞ্চলীয় সংকটের ফলে যখন যুদ্ধের আশংকা দেখা দেয়, তখন ফ্রান্স সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন। মন্ত্রী গীজো জোড়াতালি দিয়ে কোনোরকমে শেষরক্ষা করেন। কিন্তু ফরাসি যুবরাজ দ্যুক দ্য মঁ পঁসিয়ের ও স্পেনের রাজকুমারী ও সিংহাসনের উত্তরাধিকারিনী মারি লুইসা ফারনান্ডোর বিয়েকে কেন্দ্র করে আবার সংকট দেখা দেয় ১৮৪৬-এ। এই বিয়ে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতা লর্ড পামারস্টোনকে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ করে তোলে। তার ফলে ইঙ্গ-ফরাসি আঁতাতে ফাটল ধরে। ইউরোপের রক্ষণশীল রাজাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এবার গীজো লুই ফিলিপকে পরামর্শ দেন। সমগ্র ইউরোপে যখন মুক্তপন্থী হাওয়া, তখন রক্ষণশীল স্বৈরাচার। রাজতন্ত্রের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের প্রয়াস জনতাকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। রাজতন্ত্রের প্রতি বিদ্রোহ যখন ঘনীভূত, তখন সংসদীয় সংস্কারের জন্য নতুন আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনই ভোজসভা (Banquet) আন্দোলন নামে বিখ্যাত। আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল ভোটাধিকার সম্প্রসারণের আন্দোলন, ভোজসভাকে প্রচারের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে। এই আন্দোলনে বিভিন্ন বিরোধী গোষ্ঠী একত্রিত হয়েছিল।

১৮৪৮-এর ২২ ফেব্রুয়ারি সরকার এই ভোজসভার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনতা সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে গীর্জার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায় ব্যারিকেড গড়ে ওঠে। জনতার বিক্ষোভের এই স্পষ্ট চিহ্ন দেখে লুই ফিলিপ গাজোকে বরখাস্ত করেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি পররাষ্ট্র দপ্তরের সম্মুখে সৈন্যরা গুলি চালায়। সঙ্গে সঙ্গে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের রূপ নেয়। ঘটনার এই আকস্মিক পরিবর্তনে ভীত রাজা ২৪ ফেব্রুয়ারি নাবালক পৌত্র লুই ফিলিপ অ্যালবার্টের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করে

ইংল্যান্ডে নির্বাসনে যান। বিপ্লবীরা এরপর ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবে ফ্রান্সে স্থাপিত হয় দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র।

২.৮ ১৮৪৮-এর বিভিন্ন বিপ্লবের প্রকৃতি

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ১৮৪৮-এর বিপ্লব একটি নির্দিষ্ট পথ ধরে অগ্রসর হয়নি। এইসব বিপ্লবের পরিণামও বিচিত্র। তবু এই বিপ্লবসমূহ একসূত্রে গাঁথা ছিল বলা চলে। কারণ এইসব বিপ্লবের উৎপত্তি ও লক্ষ্য, ঘটনা পরম্পরা ও পরিণামের মধ্যে প্রকৃতিগত অনেক সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্য এসেছে ইউরোপীয় সভ্যতার ঐক্য ও অনৈক্যের টানাপোড়েন থেকে। ১৮১৫ থেকে ১৮৪৮-এর মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের অভিঘাতও এই সাদৃশ্যের আরেকটি কারণ।

সবচেয়ে প্রথমে যা লক্ষণীয় তা হল দেশ ও কালের সাদৃশ্য। ১৮১৫-র ভিয়েনা ব্যবস্থায় এক প্রজন্ম কেটে যাওয়ার পর ইউরোপে বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটে। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে প্রত্যেকটি বিপ্লবই ভিয়েনা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। প্রত্যেক বিপ্লবই এই ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। ১৮৪৮-এর সব বিপ্লবী অভ্যুত্থানের এই হল সাধারণ চরিত্র। ১৮৪৮-এর বিপ্লব সচেতনভাবে ফ্রান্সের ১৭৮৯-এর মহান বিপ্লবকে অনুকরণ করেছিল।

ফরাসি বিপ্লবী ঐতিহ্যকে সক্রিয় করে ইউরোপে ফরাসী নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংকল্প ছিল এই বিপ্লবের। অস্ট্রিয়া ও ইতালিতে বিপ্লব সরাসরি ভিয়েনা ব্যবস্থাকে আক্রমণ করে হ্যাবসবুর্গ আধিপত্যের বিলুপ্তি ঘটাতে চেয়েছিল। নতুন সংবিধান ও নির্বাচিত সংসদ প্রবর্তন করে ইতালি ও জার্মানীর মানুষ ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন ইতালীয় ও জার্মান রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চেয়েছিল। হাঙ্গারীতে বিপ্লব ম্যাগিয়ার (Magyar) ও শ্লাভদের পরস্পর বিরোধী স্বাধীনতার সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েছিল। অস্ট্রিয়ার বাইরে সব বিপ্লবেরই একটি নেতিবাচক ঐক্য ছিল : প্রত্যেক বিপ্লবই অস্ট্রিয়াবিরোধী, স্বৈরাচারবিরোধী ও রক্ষণশীলতা বিরোধী। কিন্তু বিপ্লবের পদ্ধতি ও লক্ষ্য সম্পর্কে মুক্তপন্থী জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে গভীর মতবিরোধ ছিল। বিপ্লবের অসাফল্যের অন্যতম কারণও তাই।

দ্বিতীয়ত, দেশে ও কালে এই বিপ্লবসমূহের পরম্পরা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বিপ্লবের উৎসকেন্দ্র ছিল দুটি—ইতালি ও ফ্রান্স। ফ্রান্সের চেয়েও শক্তিশালী ঝটিকাকেন্দ্র ছিল ইতালি। ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আগে বিপ্লব শুরু হয়েছিল ইতালির পালের্মোতে। কিন্তু ফ্রান্স তখনো বিপ্লবী প্রেরণার উৎস হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। তাই ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর মার্চে জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গারীতে বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটে। কিন্তু সর্বত্র বিপ্লব শুরু হয়ে যাওয়ার পরে প্যারিস আর বিপ্লবের কেন্দ্র থাকেনি। বরং বিপ্লবের কেন্দ্র সরে যায় ভিয়েনা ও বুদাপেস্তে, তুরীন ও রোম, ফ্লোরেন্স ও ভেনিসে। বিপ্লবের নেতৃত্ব ফ্রান্স থেকে সরে যাওয়ায় এই বিপ্লবের জাতীয়তাবাদী চরিত্র ধরা পড়ে। ব্রিটেনের মতো ফ্রান্সও একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয়েছে। তাই ফ্রান্সও ব্রিটেনের মতো তৃপ্ত, রক্ষণশীল। কিন্তু ইতালির জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার কামনা জার্মানী অথবা পোল্যান্ড অথবা রুমানিয়ার ঐক্য ও স্বাধীনতার কামনার সঙ্গে একসুরে বাঁধা ছিল।

তৃতীয়ত, যখন ইউরোপে বিপ্লবের আগুন জ্বলছিল, তখন কোনো কোনো দেশে কেন সামান্য গণ্ডগোল হয়েছে অথবা কিছুই হয়নি তা বিশেষভাবে অর্থবহ হয়ে ওঠে। যেমন পশ্চিমে ব্রিটেন ও বেলজিয়ামে এবং পূর্বে রাশিয়া এবং পোল্যান্ডে বিপ্লব হয়নি। বিপ্লব প্রধানত মধ্য ইউরোপে ঘটেছে। যেসব দেশে শিল্পায়নের পরিমাণ কম, (যেমন—জার্মানি, ইতালি ও সুইটজারল্যান্ড) আর যেসব দেশ কৃষিপ্রধান ও কৃষক অধ্যুষিত (যেমন বল্‌কান অঞ্চলের দেশসমূহ) সেইসব দেশেই বিপ্লব হয়েছে।

১৮১৫ থেকে ১৮৪৮-এর মধ্যবর্তী যুগে ইউরোপের অর্থনৈতিক প্রসার এবং ফরাসি বিপ্লবী ঐতিহ্যের সঙ্গে ১৮৪৮-এর বিপ্লবের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। মূলত তিনটি উপাদানের সংমিশ্রণে এ যুগের বিপ্লবী মেজাজ গড়ে উঠেছিল। এই তিনটি উপাদান হল : ১৮১৫-র আগেকার ভাবধারা ও আদর্শের আলোড়ন; অভাবনীয় জনস্ফীতির জন্য অস্থিরতা, এবং শিল্প ও পরিবহন ব্যবস্থার বিকাশ প্রসূত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির সামগ্রিক পরিবর্তন। দেশে দেশে এই তিনটি উপাদানের গুরুত্বের তারতম্য ঘটেছে। কিন্তু সর্বত্রই এই তিনটি উপাদানের উপস্থিতি চোখে পড়ে।

১৮৪৮-এর বিপ্লবসমূহকে শহুরে বিপ্লব বলা যেতে পারে। সব বিপ্লবেরই উৎস শহর, প্রেরণাও শহর। ইউরোপের সব দেশে শহরের মানুষেরাই প্রথমদিকে বিপ্লবের ঘটনা পরম্পরাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। লন্ডন ও বার্মিংহাম, প্যারিস ও ব্রাসেলস, ভিয়েনা ও বুদাপেস্ত বিপ্লবের গতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এ কথা বলা যেতে পারে যে, পূর্ব ইউরোপে যেসব শহরে এক লক্ষের বেশি অধিবাসী ছিলো, সেইসব শহরেই বিপ্লব এসেছে।

সব বিপ্লবেরই নেতৃত্ব এসেছিল বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্র, সাংবাদিক ও কবি—এরাই বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছেন। লামার্তিন ও পেটোফির মতো কবি, মাজ্জিনি ও কোসুথের মতো সাংবাদিক, প্যালাকি, ডালমান ও বালসেসকোর মতো ঐতিহাসিক এইসব বিপ্লবের এক একটি রোমান্টিক চরিত্র। বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বধীন এইসব শহুরে বিপ্লবের ভাগ্য কিন্তু নির্ভর করছিল কৃষকদের উপর। ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার কৃষক জমির বিপ্লবের পর মালিকানা পেয়ে যায়।

প্রাগ্রসর শিল্পায়িত দেশে, বিশেষত ব্রিটেন, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে এবং অনেকাংশে জার্মানিতে ও ইতালিতে একটি শ্রমিকশ্রেণী গড়ে উঠেছিল। ১৮৪৮-এ এই শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব উপহার দিয়েছিল প্রাগের রক্তাক্ত 'জুনের দিন' এবং ভিয়েনার অক্টোবরের দিন'। এই প্রসঙ্গে ১৮৪৮-এর বিপ্লবের একটি বিশেষ পরিণাম স্মরণীয়। এই বিপ্লবের ফলে প্রাপ্ত-বয়স্কের ভোটাধিকার সমাজতন্ত্র নিয়ে আসতে পারে, বুর্জোয়াশ্রেণীর এই ভয় আর ছিল না। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল এই বিপ্লবের পর।

১৮৪৮-এর নানা বিপ্লবকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিল একটি রাজনৈতিক বাস্তব। এ যুগের রাজনীতির সবচেয়ে সম্ভাবনময় হাতিয়ার জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদ কোনো কোনো দেশে বিভিন্ন অংশের ঐক্যের আন্দোলনের রূপ নিয়েছিলো। যেমন জার্মানি ও ইতালিতে। কোনো কোনো দেশে বিদেশী রাষ্ট্রের অধীনতা থেকে মুক্তির আন্দোলনের রূপ নেয় জাতীয়তাবাদ। যেমন অস্ট্রিয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশসমূহ। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

যাইহোক, ফ্রান্সে বিপ্লব সংগঠিত হবার পরই এই বিভিন্ন ধরনে তা ইউরোপের অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এর কারণের আঞ্চলিক বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক সংকটই যে বিপ্লব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার কারণ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রাজতন্ত্রী ও বুর্জোয়া, বুর্জোয়া ও পাতি-বুর্জোয়া, বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণী—কৃষকশ্রেণী—এই ধরনের শ্রেণীবিরোধ বিপ্লবের গতি আরো বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং সাধারণভাবে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবসমূহের দ্রুত বিস্তারের প্রধান কারণ রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সংকট ও শ্রেণী বিরোধ।

তবে পরিবর্তনের আদর্শ ১৮৩০ থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত বহু আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেলেও ১৮৪৮-এর পর কিন্তু সাময়িকভাবে রক্ষণশীলতারই জয় হয়। ১৮৫০ সাল নাগাদ জার্মান ও ইতালিয়ান জাতীয়তাবাদী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে, স্লাভ হাংগারি ও রুমানিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনও ভেঙে যায়। প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়াতেও সাবেকপন্থীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি ফ্রান্সে ১৮১৫ সালে তৃতীয় নেপোলিয়ন দ্বিতীয় সাম্রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হন। সুতরাং ১৮১৫ থেকে ১৮৫০ এই সময়পর্বকে উচ্চ আশা ও আদর্শের যুগ বলা গেলেও পূর্ণ সাফল্যের যুগ সম্ভবত বলা যায়না।

২.৯ সারসংক্ষেপ

উনিশ শতকের ফ্রান্সের ইতিহাস ফরাসি বিপ্লবেরই অনুবৃত্তি। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ফ্রান্সের মানুষ লোকায়ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছে। কখনও তারা দু'পা এগিয়েছে, কখনও এক পা পিছিয়েছে। ১৮১৫ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের সিংহাসনে ছিল বুরবোঁ বংশ। ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লবের ফলে এই রাজবংশ সিংহাসন হারায়। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের আশায় ফরাসিরা অর্লেয়াঁ বংশের লুই ফিলিপকে বসায়। কিন্তু এই রাজাও স্বৈরাচারের দিকে ঝুঁকে যাওয়ায় ১৮৪৮-এর বিপ্লবে বিতাড়িত হন। ফ্রান্সে ঘোষিত হয় দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্র বা Second Republic। বিপ্লবের ঢেউ ফ্রান্সের বাইরে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য ১৮৪০ নাগাদ এই ঢেউ কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে।

২.১০ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন।

১। ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লবের কারণ ব্যাখ্যা করুন।

২। ফ্রান্সে ও তার বাইরে জুলাই বিপ্লবের প্রভাব কি ছিল?

৩। ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের দ্রুত সংগঠনের কারণ কি?

৪। ১৮৪৮-এর ইউরোপীয় বিপ্লবগুলোর সাধারণ প্রকৃতি ও চরিত্র ছিল কি?

৫। আপনি কি মনে করেন যে, ১৮১৫—১৮৪৮ যতটা 'প্রত্যাশার যুগ', ততটা 'প্রাপ্তির যুগ' নয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন।

১। উনিশ শতকের ইউরোপের স্বতঃবিরোধী মতবাদের সংঘাত বলতে কি বোঝায়?

২। অষ্টাদশ লুই কি উদার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন?

৩। দশম চার্লস কতটা প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন?

৪। ১৮৩০-এর ফরাসি অর্ডিন্যান্সগুলি কি কি?

৫। ১৮৩০-এর বিপ্লবের কি প্রভাব ইংল্যান্ডের উপর পড়ে?

৬। ১৮৪৮-এর বিপ্লবে শ্রমিকদের ভূমিকা কি ছিল?

৭। 'ভোজসভা আন্দোলন' কি?

৮। ১৮৪৬-এর বিবাহ সংকট ব্যাখ্যা করুন।

৯। ১৮৪৮-এর বিপ্লব কোন রাজবংশকে ফরাসী সিংহাসন থেকে সরিয়ে দেয়?

১০। ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্র কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?

২.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। J. Grenrille : Europe Reshaped

২। Jonathan Sperber : The European Revolutions.

৩। G. Ruggiero : The History of European Liberalism.

৪। B. L. Woodward : French Revolutions.

৫। P. Robertson : Revolutions of 1848.

৬। প্রফুল্ল চক্রবর্তী : য়োরোপের ইতিহাস।

একক ৩ □ দ্বিতীয় সাম্রাজ্য ও তৃতীয় নেপোলিয়ন প্যারিকমিউন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ ফ্রেব্রুয়ারি বিপ্লব ও দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র

৩.৪ লুই নেপোলিয়ন

৩.৫ লুই নেপোলিয়নের জনসমর্থন লাভের কারণ

৩.৬ তৃতীয় নেপোলিয়নের অভ্যন্তরীণ নীতি

৩.৭ তৃতীয় নেপোলিয়নের বিদেশনীতি

৩.৮ তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের কারণ

৩.৯ তৃতীয় নেপোলিয়ন : একটি মূল্যায়ন

৩.১০ তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও প্যারি কমিউনের বিদ্রোহ

৩.১১ প্যারি কমিউনের প্রতিষ্ঠার পটভূমি

৩.১২ প্যারি কমিউনের চরিত্র ও কার্যাবলী

৩.১৩ প্যারি কমিউনের পতনে কারণ

৩.১৪ কমিউনের তাৎপর্য

৩.১৫ সার-সংক্ষেপ

৩.১৬ অনুশীলনী

৩.১৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ উদ্দেশ্য

১৮৪৮ সালের বিপ্লবের পর ফ্রান্সে বুর্জোয়াদের স্থাপন করা দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রকে নষ্ট করে কিভাবে তৃতীয় নেপোলিয়ন দ্বিতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ১৮৭০ সালে সেই সাম্রাজ্যের পতনের পর কেন প্যারিসে একটি স্বতন্ত্র কমিউনের উত্থান ও পতন ঘটেছিল, তার বিস্তারিত আলোচনা করাই বর্তমান এককটির উদ্দেশ্য।

৩.২ প্রস্তাবনা

ফ্রান্সের ১৮৪৮ সালের গণবিপ্লবের সাফল্য ছিল সাময়িক। এই বিপ্লবের পর যে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রথম নেপোলিয়ঁ বা নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ভ্রাতুষ্পুত্র লুই নেপোলিয়ঁ বা তৃতীয় নেপোলিয়ন। বুর্জোয়াদের দুর্বলতা, প্রজাতন্ত্রীদের মতবিরোধ এবং নেপোলিয়নের ঐতিহ্যের প্রতি ফরাসিদের মোহকে কাজে লাগিয়ে লুই নেপোলিয়ন ১৮৫২ সালে প্রজাতন্ত্রকে নাকচ করে ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ১৮৭০ সালে এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং ফ্রান্সের রাজধানীতে শ্রমজীবীদের সরকার 'প্যারি কমিউন' নাম নিয়ে গড়ে ওঠে। ছ'সপ্তাহ পরে অবশ্য প্রজাতন্ত্রীদের হাতে কমিউনেরও পতন ঘটে। বর্তমান এককে এই ঘটনাপরম্পরাই নির্দেশিত হবে।

৩.৩ ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ও দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র

ফ্রান্সে ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর প্রজাতন্ত্রী দলের যৌথ উদ্যোগে একটি অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছিল। কিন্তু মার্চ ও এপ্রিল মাসে তাদের মধ্যে বিভেদ তীব্র হয়ে ওঠে এবং পরবর্তী নির্বাচনে লুই ব্লাঁ-র সমাজতন্ত্রী দল পরাজিত হওয়ায় বামপন্থীদের মধ্যে বিক্ষোভ বাড়তে থাকে। ইতিমধ্যে পোল্যান্ডের বিপ্লবে ফরাসি প্রজাতন্ত্রী সরকার কোন সাহায্য না করায় সমাজতন্ত্রীরা পনেরোই মে তারিখে বিধানসভা ভবন অধিকার করার চেষ্টা করে। বিদেশমন্ত্রী লা মাতিন-এর চেষ্টায় অবশ্য বিধানসভা রক্ষা পায়। এরপর জুন মাসে সরকার সব জাতীয় কর্মশালা বন্ধ করে দেয়, বেকার হয়ে যায় লক্ষাধিক শ্রমিক। ২৩-জুন তারা প্রতিবাদ অবরোধে সামিল হয়। এই বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমন করেন দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের যুদ্ধমন্ত্রী য়্যজেন কাভেনিয়াক (Eugene Cavaignac)। ২৩ থেকে ২৬ জুন—এই চারদিনে প্রায় দশহাজার মানুষ হতাহত হয়। কয়েক হাজার শ্রমিক কারারুদ্ধ হয়। ইউরোপের ইতিহাসে তাই দিনগুলো 'জুন ডেজ' নামে কলঙ্কিত হয়ে আসে। ঐতিহাসিকরা বলেন, সন্ত্রাসের রাজত্বেও ফ্রান্সে এত রক্তক্ষয় হয়নি।

শ্রমিকদের ও সমাজতন্ত্রীদের দমন করবার পর ফ্রান্সের National Assembly বা জাতীয় সভা, মার্কস-এঙ্গেল্‌স-এর ভাষায় Assembly of Capitalists, একটি সংবিধান প্রস্তুত করে। সংবিধানে প্রশাসনের প্রধান হিসেবে চার বছরের জন্য জন-নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের রক্ষকরা ভেবেছিলেন, ক্ষমতাবান প্রেসিডেন্ট সরকারকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে পারবেন। কিন্তু পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল তাদের সবাইকেই হতচকিত করে দেয়। নির্বাচনে লা মাতিন বা কাভেনিয়াককে হটিয়ে দিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ভ্রাতুষ্পুত্র লুই নেপোলিয়ন বা তৃতীয় নেপোলিয়ন।

৩.৪ লুই নেপোলিয়

লুই নেপোলিয়ন ছিলেন বোনাপার্ট-পত্নী জেসোফিন-এর কন্যা হরটেন্‌শ্‌ ব্যুহানে এবং বোনাপার্ট-ভ্রাতা লুই-এর সন্তান। প্রথম নেপোলিয়ন-এর পুত্র 'ডিউক অব্‌ রাইখস্টাড্‌ট্‌' যেহেতু দ্বিতীয় নেপোলিয়ন হিসেবে চিহ্নিত ছিলেন, তাই লুই নেপোলিয়ন নিজেকে তৃতীয় নেপোলিয়ন হিসেবে পরিচিত করে বোনাপার্টীয় ধারার প্রবহমানতাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। নেপোলিয়ন পতনের পর তিনি ইতালিতে পালিয়ে গিয়ে 'কারবোনারি' সমিতির সদস্য হয়েছিলেন। ১৮৩০-এর বিপ্লবের পর তিনি ফ্রান্সে ফিরে এসে দু'বার (১৮৩৬, ১৮৪০) ষড়যন্ত্র করে ক্ষমতা দখলের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। ষড়যন্ত্রের শাস্তিস্বরূপ ১৮৪০ থেকে ১৮৪৬ পর্যন্ত তিনি কারাদণ্ডও ভোগ করেন। ১৮৪৬-এ হ্যাম দুর্গের কারাগার থেকে তিনি পালিয়ে যান এবং ৪৮-এর বিপ্লবের পর আবার ফ্রান্সে ফিরে আসেন। ধনী অভিজাত বন্ধুদের সাহায্যে তিনি রাজনৈতিক পরিচিতি লাভ করেন এবং ফরাসিদের মনে বেঁচে থাকা বোনাপার্টের গৌরবের স্মৃতিকে কৌশলে কাজে লাগাতে থাকেন। কুখ্যাত 'জুন-ডেজ'-এর পর প্রজাতন্ত্রীদের প্রতি ফরাসিদের তীব্র বিরক্তির সুযোগে তিনিই সবাইকে অবাক করে দিয়ে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

৩.৫ লুই নেপোলিয়নের জনসমর্থন লাভের কারণ

লুই নেপোলিয়ন এমন একটা সময়ে জনসমর্থন চেয়েছিলেন যখন ফ্রান্সের মানুষ সমর্থন করবার জন্যই একজন অপ্রজাতন্ত্রী কিন্তু জনদরদী ব্যক্তিত্বের সন্ধানে ছিল। জুন দিনের অভিজ্ঞতা তাদের ক্লান্ত-বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল। এর থেকে মুক্তির জন্য তারা লুই-এর হাত ধরতে চেয়েছিল। কেননা ইতিমধ্যেই লুই তাঁর The Napoleonic Ideas' এবং 'The Extinction of Pauperism' বই দুটোতে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট-এর বিপ্লব-বন্ধুত্বের দিনগুলো ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দিয়েছিলেন। দরিদ্রের জন্য, ফরাসিদের সকলের জন্য তাঁর দুশ্চিন্তা ও সমাধান-স্বপ্নের কথা শুনিয়েছিলেন। ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবীরা, স্বল্পবিত্তরা তাঁকে দেখেছিলেন এক ভিন্ন ব্যবস্থার প্রতীক হিসেবে। উচ্চবিত্তরা ভেবেছিলেন, বোনাপার্টের মতো ফরাসি-পুঁজির লক্ষণীয় স্ফীতির ব্যবস্থা তিনি করবেন। লুই নেপোলিয়ন রোমান ক্যাথলিক চার্চকেও তুষ্ট করতে ভোলেননি। পাদ্রীদের তিনি বুঝিয়েছিলেন, রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা হাতে পেলে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার পাশাপাশি চার্চ-নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাও চালু করা হবে। অর্থাৎ ফ্রান্সের সবশ্রেণীর মানুষই তাঁর প্রতি মোহগ্রস্ত হয়েছিল। নেপোলিয় বোনাপার্ট নিজেই তাঁর শেষ জীবনে যে 'মিথ' তৈরি করে গিয়েছিলেন, যে মিথকে অর্লেয়া রাজতন্ত্র ব্যবহার করবার চেষ্টা করেছিল বুঁধ রাজতন্ত্রকে নিষ্প্রভ করে দেখানোর উদ্দেশ্যে, সেই মিথকেই লুই নেপোলিয়ন নিজের স্বার্থে সার্থক ব্যবহার করেছিলেন। তাই তার বিপুল জনসমর্থন। নির্বাচনে তিনি চার মিলিয়ন ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে

দিয়েছিলেন প্রজাতন্ত্রী কাভিয়েনাককে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি কাজ চালিয়েছিলেন মাত্র চার বছর। যেহেতু প্রেসিডেন্টের হাতে ক্ষমতা ছিল অনেক এবং প্রকৃত জনভিত্তি না থাকায় প্রজাতন্ত্রী নেতৃত্ব ছিল দুর্বল, তাই অল্প সময়ের মধ্যেই একনায়কত্ব অর্জন করেছিলেন তৃতীয় নেপোলিয়। অবশেষে তিনি ১৮৫২ সালে এক গণভোটের রায় নিয়ে নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন এবং ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠা করেন দ্বিতীয় সাম্রাজ্য।

৩.৬ তৃতীয় নেপোলিয়ন অভ্যন্তরীণ নীতি

প্রথম নেপোলিয়নের মতোই তৃতীয় নেপোলিয়নও একটি কঠোর কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আর সর্বোচ্চ ক্ষমতা রেখেছিলেন নিজের হাতে। অবশ্য একটি সেনেট ও দ্বিকক্ষযুক্ত আইনসভা ছিল। আইনসভার ওপরের কক্ষকে বলা হত 'কাউন্সিল অব্ স্টেট', নিম্নকক্ষকে বলা হত আইন পরিষদ, তার সদস্যসংখ্যা ২৬০। আইনসভার ক্ষমতা ছিল সামান্য। সংবিধানের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ছিল সেনেট। মন্ত্রীপরিষদ কিন্তু আইনসভা বা সেনেটের কাছে দায়বদ্ধ ছিল না। তাঁরা সম্রাটের কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন। তাদের অধীনে 'প্রিফেক্ট' পদবাচ্য আমলারা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে, কমিউন ও পৌরসভায় সম্রাটের নির্দেশ বলবৎ করত। তৃতীয় নেপোলিয়ন সেনাদের পদোন্নতির প্রচুর সুযোগ দিয়ে, তাদের বেশি মর্যাদা ও বেতন দিয়ে অনুগত করে রেখেছিলেন। রোমান ক্যাথলিক চার্চকেও তৃতীয় নেপোলিয়ন নানাভাবে তুষ্ট করেছিলেন। তাঁর আমলে যাজকদের অর্থ ও প্রতিপত্তি দুইই বেড়েছিল। আর বেড়েছিল রাজধানীর জমক। তৃতীয় নেপোলিয়ন জর্জ হসম্যানকে প্যারিসের 'Prefect of the Seine' নিযুক্ত করেন। হসম্যান সম্রাটের মনের মতো করে আধুনিক সাজে সাজিয়ে ছিলেন প্যারিস শহরকে। ডেভিড টমসন একে বলেছেন, International Showmanship.

তবে তৃতীয় নেপোলিয়নের অভ্যন্তরীণ নীতি উদ্দেশ্যহীন ছিল না। বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব ফরাসি নাগরিক জীবনে যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছিল, তার অবসান ঘটানো ছিল তাঁর লক্ষ্য। ফ্রান্স তখনো প্রধানত কৃষির ওপর দাঁড়িয়ে। তৃতীয় নেপোলিয়ন তাই কৃষকদের দিকে নজর দিয়েছিলেন। সরকারের তরফে ঢালাও কৃষিঋণ আর অল্প সুদের বিধান দিয়ে তিনি ক্ষুদ্র জমির মালিকদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

শিল্প থেকেও মুখ ফিরিয়ে নেননি তৃতীয় নেপোলিয়ন। শিল্পের প্রয়োজনে পরিবহণের উন্নতি ঘটিয়েছিলেন তিনি। ১৮৫৯ থেকে ১৮৭০-এর মধ্যে ফ্রান্সের রেলপথের বিস্তার জার্মানী ও ব্রিটেনের সঙ্গে তুলনীয় ছিল। রেলপথের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই কয়লা শিল্প ও ধাতুশিল্পের বৈপ্লবিক বিকাশ ঘটেছিল।

আলফ্রেড কোবান মনে করেন, তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলে ফ্রান্সে ঋণব্যবস্থার সার্থক ব্যবহার সম্ভব হয়েছিল। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যকে তাই ব্যাঙ্কিং-এর স্বর্ণযুগও বলা চলে। সরকারি ও বেসরকারি—দুই প্রকার সংস্থা থেকেই ঋণ দেওয়া হত। সরকারি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলি হল—কঁতোয়া দ্য কোঁতে (Comptoir d'es Compute), ক্রেডিট ফঁসিয়ের (Credit Foncier) এবং ক্রেডিট এগ্রিকোল (Credit Agricole)। বেসরকারি ব্যাঙ্কের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পেরিয়র ভ্রাতৃদ্বয়ের ক্রেডিট মবিলিয়ের (Credit Mobilier)। ১৮৬৩-তে আর একটি বড় বেসরকারি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ক্রেডিট লিয়ন্যে (Credit Lyonnais)। এই বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলোর সঙ্গে যুক্ত ছিল বিখ্যাত 'রথস্চাইল্ড' সংস্থা। বলা যেতে পারে ফ্রান্সের মুদ্রাব্যবস্থা সচলতর হয়ে উঠেছিল তৃতীয় নেপোলিয়নের পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট এইসব ব্যাঙ্কের কল্যাণে। তাতে লাভবান হয়েছিল কৃষি ও শিল্প।

রাষ্ট্রে উৎপাদক শ্রেণীর স্বার্থে সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত, ফরাসি সমাজতন্ত্রবাদী দার্শনিক সেঁ সিমঁ-র এই বক্তব্য তৃতীয় নেপোলিয়ন নীতির ওপর প্রভাব ফেলেছিল কিনা, সেই প্রশ্ন অনেকে তুলেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। তবে গ্রেনভিল যে শিল্পের ক্ষেত্রে তৃতীয় নেপোলিয়র অবদানকে মোটেই বড় করে দেখতে চান না, সেটা ঠিক নয়। শুধু মুদ্রা ব্যবস্থার উন্নতি করে নয়, অন্যান্য নানা উপায়েও সম্রাট শিল্পের বাঁধন খুলে দিয়েছিলেন। ১৮৬৪-তে শ্রমিক আন্দোলনের অধিকার মেনে নিয়ে তিনি ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অনুমতি দিয়েছিলেন। শ্রমিকদের একটি প্রতিনিধি দলকে তিনি রাষ্ট্রের খরচে ইংল্যান্ড পাঠিয়েছিলেন। শ্রম-বিবাদ মেটানোর জন্য তিনি সালিসী-বোর্ড স্থাপন করেছিলেন। নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং ধর্মঘট আটকানোই সম্ভবত তৃতীয় নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য ছিল। এর ফলে শিল্পায়নের যে অনেক বাধাই দূর করা গিয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শাসনের দ্বিতীয় পর্বে, বিদেশনীতির ব্যর্থতার সময়ে, তৃতীয় নেপোলিয়ন অভ্যন্তরে বোনাপার্টির উদারনীতির প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া, আইনসভাকে বাড়তি ক্ষমতা দেওয়া এরই অঙ্গ ছিল। এমনকি ১৮৬০-এর পর জনসভা ডাকার অধিকারও ফরাসিদের দেওয়া হয়, সেইসঙ্গে শিথিল করা হয় সংবাদপত্রের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ।

৩.৭ তৃতীয় নেপোলিয়নের বিদেশনীতি

বোনাপার্টির মিথকে আশ্রয় করে ক্ষমতায় এসেছিলেন তৃতীয় নেপোলিয়ন। সেই মিথ-এর একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল সফল চোখ ধাঁধানো বিদেশনীতি। তাই তৃতীয় নেপোলিয়নকেও আন্তর্জাতিক মর্যাদালাভের যোগ্য পররাষ্ট্রীয় নীতি অনুসরণ করতে হয়, যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ফরাসিদের গৌরব-বাসনাকে তৃপ্ত করা। কিন্তু এ ব্যাপারে তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁর অভ্যন্তরীণ নীতির মতো সফল হননি। কারণ কূটনীতি ও সমর-পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রথম নেপোলিয়নের মতো সাধ থাকলেও সাধ্য তাঁর ছিল না। তাঁর বিদেশ নীতিকে স্পষ্ট

দুটো পর্যায়ে ভাগ করা যায়। শাসনকালের প্রথম আটবছর (১৮৫২-১৮৬০) ছিল সাফল্যের যুগ, আর বাকি দশবছর ছিল (১৮৬০-১৮৭০) ব্যর্থতার পর্ব।

তৃতীয় নেপোলিয়নের বিদেশ নীতির প্রথম সাফল্য এসেছিল ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (১৮৫৪-৫৬)। বলকান অঞ্চলে অটোমান তুর্কীদের অধীনস্থ জাতিগুলির সমর্থনে রাশিয়ার বিরুদ্ধে তিনি ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগ দেন। প্রকাশ্যে তিনি জেরুজালেমের পবিত্র চার্চের রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার দাবি করেন। কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল মস্কো অভিযানে প্রথম নেপোলিয়নের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়া। যুদ্ধে লুই নেপোলিয়ন সফল হয়েছিলেন। সন্ধির স্থান হিসেবে প্যারিসকেই সকলে বেছে নেন, ফলে ফ্রান্স আবার ইউরোপীয় রাজনীতির কেন্দ্রে ফিরে আসে। প্যারিসের চুক্তিতে মোলাডাভিয়া ও ওয়ালাসিয়ার সংযুক্তি করে রুমানিয়ার উদ্ভবের প্রস্তাবে সায় দিয়ে তিনি জাতীয়তাবাদের সমর্থক হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিচিতি ও ফরাসিদের কৃতজ্ঞতা লাভ করেন।

এর চাইতেও বেশি কৃতিত্ব তৃতীয় নেপোলিয়ন অর্জন করেন ইতালিতে। ইতালির জাতীয় ঐক্যের আন্দোলন তিনি সমর্থন করতেন। ১৮১৫ সালের গ্লানি মুছে ফেলার এটা ছিল একটা উপায়। তিনি ভেবেছিলেন, অস্ট্রিয়ার আধিপত্য থেকে ইতালির মুক্তির লড়াইয়ে ফ্রান্স সাহায্য করলে, মুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ ইতালির ওপর ফ্রান্সের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই ১৮৫৮ সালের জুলাই মাসে পিডমন্ট-সার্ডিনিয়ার মন্ত্রী কাউন্ট ক্যাভুরের সঙ্গে প্লমবিয়ার্সের চুক্তি করেছিলেন। ক্যাভুরকে সম্রাট এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, অস্ট্রিয়ার সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধে তিনি ইতালিয়দের সাহয্য করবেন। ফরাসি সাহায্যে পুষ্ট হয়েই ক্যাভুর 'ম্যাজেন্টা' ও 'সলফেরিনো'র যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে হারিয়েছিলেন। চারদিকে তখন ফ্রান্সের জয় জয়কার। কিন্তু ইতিমধ্যে পোপের রাজ্যের ভবিষ্যতে অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় গোঁড়া ফরাসি ক্যাথলিকরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে দেখে তৃতীয় নেপোলিয়ন চুক্তি থেকে সরে আসেন। তাছাড়া প্রাশিয়া অস্ট্রিয়ার সমর্থনে রাইন অঞ্চলে সেনা পাঠানোয় ফরাসি বাহিনীর সাফল্যও নিশ্চিত ছিল না। তাই তৃতীয় নেপোলিয়ন কূটনৈতিক পটবদলের আশ্রয় নিয়ে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে করেছিলেন ভিল্লফ্রাঙ্কার সন্ধি। অবশ্য টাস্কানি, মডেনা এবং রোমাগনা যাতে সার্ডিনিয়ার সঙ্গে মিলে যেতে পারে, তার জন্য তিনি ক্যাভুরকে আগের মতোই সাহায্য করেছিলেন, বিনিময়ে ১৮৬০-এ ক্যাভুর ফ্রান্সকে দিয়েছিলেন স্যাভয় এবং নিস। এভাবে ১৮১৫ সালের ভিয়েনা চুক্তির একটি গ্লানিময় শর্ত থেকে ফ্রান্সকে মুক্ত করে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তৃতীয় নেপোলিয়ন।

কিন্তু এরপরেই শুরু হয়েছিল নেপোলিয়নের ব্যর্থতার পর্ব। ক্রিমিয়া এবং ইতালি—এই দুটি যুদ্ধে যোগ দিয়ে ফ্রান্সের অর্থনীতি অল্প হলেও ঘা খেয়েছিল। ব্রিটেনের সঙ্গে কবডেনের চুক্তি করে (১৮৬০) সম্রাট একদিকে শক্তির বাণী আর অন্যদিকে উদার বাণিজ্যনীতির সুফল ছড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাইরের সামরিক অশান্তি তাঁর পিছু ছাড়েনি। ১৮৬৩ সালে রাশিয়ার শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে পোল্যান্ড ফ্রান্সের কাছে সাহায্য চায়। নেপোলিয়ন বিদ্রোহীদের পক্ষ সমর্থন করে রুশ জার-এর কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠান। কিন্তু

জার ফ্রান্সের প্রতিবাদকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তৃতীয় নেপোলিয়নের মর্যাদা ধুলোয় মিশিয়ে দেন। নৃশংসতার সঙ্গে তিনি পোল্যান্ডের বিদ্রোহ দমন করেন। নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থাকা ছাড়া তৃতীয় নেপোলিয়নের আর কিছু করার ছিল না।

সম্রাটের পরবর্তী ব্যর্থতার ক্ষেত্র ছিল মেক্সিকো। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সুযোগে মেক্সিকোর প্রজাতন্ত্র নষ্ট করে তিনি ১৮৬৪ সালে তার বশংবদ ম্যাক্সিমিলিয়ঁকে মেক্সিকোর সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। কিন্তু গৃহযুদ্ধের শেষে আমেরিকার চাপে তিনি মেক্সিকো থেকে ফরাসি সেনা তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অসহায় ম্যাক্সিমিলিয়ঁকে মেক্সিকোর শাসকগোষ্ঠী নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করায় কূটনৈতিক-সামরিক গ্লানির দায়ভার নিতে হয়েছিল তৃতীয় নেপোলিয়নকে। এমনকি চীনে ফরাসি ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ সুবিধা আদায় বা কোচিন-চীন দখল করার গৌরবও এই ব্যর্থতার মুখে ম্লান হয়ে যায়।

এই পরিস্থিতিতেই ১৮৬৬ সালে প্রাশিয়া অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। ফ্রান্সের বুর্জোয়া গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা প্রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধিকে আশঙ্কার চোখে দেখেছিলেন। কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়নের ধারণা ছিল অন্যরকম। প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বিসমার্কের কূটনৈতিক আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, অস্ট্রিয়াকে আঘাত করাই প্রাশিয়ার মূল লক্ষ্য, ফ্রান্সের সঙ্গে সে কখনোই শত্রুতা করবে না। তৃতীয় নেপোলিয়ন তখন ভিয়েনা-ব্যবস্থার পরিবর্তন, অস্ট্রিয়ার পরাজয়—এই জাতীয় স্বপ্নে মগ্ন। প্রাশিয়াকে তিনি 'জেনার'— (Jena) যুদ্ধে (প্রথম নেপোলিয়নের সময়ে) ফ্রান্সের হাতে পরাজিত একটি রাষ্ট্র হিসেবেই দেখেছিলেন। কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়নের বুঝতে ভুল হয়েছিল। বিসমার্কের কূটনীতির কাছে তিনি পরাস্ত হয়েছিলেন। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে প্রাশিয়া ফ্রান্সের সীমানায় একটি প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের সূচনা করায় ফরাসীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হল, কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়নের করার কিছু রইল না। বরং প্রাশিয়ার কাছে কিছু ভূখণ্ড ও অর্থ দাবি করে তিনি পরধনলোভী বলে নিন্দিত হলেন। ইংল্যান্ড ও অন্যান্য জার্মান রাজ্য তাঁর বিরুদ্ধে চলে গেল।

এরপরেই প্রাশিয়া ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়েছিল। ফ্রান্সকে না হারিয়ে বিসমার্ক দক্ষিণ জার্মান রাজ্যগুলোর ওপর আধিপত্য নিশ্চিত করতে পারছিলেন না বলেই তাঁর পক্ষে এই যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। স্পেনের রাজসিংহাসনে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নে প্রাশিয়ার রাজবংশের অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করে ফ্রান্স থেকে যে অনুরোধ প্রাশিয়ায় গিয়েছিল সে অনুরোধ প্রাশিয়ার রাজা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, এবং 'এমস্' থেকে টেলিগ্রাম করে খবরটা বিসমার্ককে জানিয়েছিলেন। সেই টেলিগ্রামটি চতুর বিসমার্ক এমনভাবে কাগজে ছাপিয়েছিলেন এবং প্রাশিয়ারাজের প্রত্যাখ্যানপর্ব এমনভাবে বর্ণনা করেছিলেন, যাতে ফ্রান্স খুবই অপমানিত বোধ করে এবং প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা নেয়। ঘটনাক্রম বিসমার্কের পথেই গড়ায়, পরিস্থিতির ওপর তৃতীয় নেপোলিয়ন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং ঐ 'এমস্ টেলিগ্রামের' প্রতিক্রিয়ায় ১৮৭০-এর ১৯ জুলাই প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন। এই যুদ্ধই ছিল তাঁর শেষ যুদ্ধ। সেডানের যুদ্ধে ফ্রান্স শোচনীয়ভাবে

পরাজিত হয়, তৃতীয় নেপোলিয়ন ইংল্যান্ডে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে চলে যান, সেই সঙ্গে ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটে।

সামরিক ব্যর্থতার জন্য তৃতীয় নেপোলিয়ন নিজে সম্পূর্ণভাবে দায়ী ছিলেন, একথা বলা যাবে না। সামরিক কমিশন গঠন করে সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণ করতে তিনি চেয়েছিলেন। কিন্তু সামরিক খাতে অর্থব্যয় করতে বাধা দিয়েছিল আইনসভার প্রজাতান্ত্রিক সদস্যরা। ইতিমধ্যে প্রশাসনিক উদারীকরণের কথা ঘোষণা করায় এই বিরোধিতাকেও তৃতীয় নেপোলিয়ন অগ্রাহ্য করতে পারেননি। ফলে একদিকে অভ্যন্তরীণ উদারতা আর অন্যদিকে বৈদেশিক মর্যাদা-প্রয়াস—এই দুই-এর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব তার অবস্থানকে দুর্বল করে দিয়েছিল। গ্রেনভিল ঠিকই মন্তব্য করেছেন, "Napoleon's efforts to move away from autocracy to the Liberal Empire which strengthened the regime at home came fatally to weaken it abroad"।

তবে কূটনৈতিক ব্যর্থতার জন্য তৃতীয় নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত দায় অবশ্যই ছিল। পোল্যান্ডের ঘটনায় তিনি রাশিয়াকে শত্রু করেছিলেন, ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি করে চটিয়েছিলেন ক্যাভুরকে, অস্ট্রো-প্রাশিয়া যুদ্ধে নিরপেক্ষ থেকে অস্ট্রিয়ার বৈরিতা ডেকে এনেছিলেন, আবার যুদ্ধের পর ক্ষতিপূরণ চেয়ে ক্ষুব্ধ করেছিলেন ইংল্যান্ড ও জার্মান রাজ্যগুলোকে, এদিকে প্রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীর সম্ভাবনা তো ছিলই না। অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে তৃতীয় নেপোলিয়নের কূটনৈতিক ভ্রান্তির মূল্য দিতে হয়েছিল ফ্রান্সকে। ফ্রান্স ইউরোপীয় চালচিত্রে মিত্রহীন একঘরে হয়ে পড়েছিল। সুতরাং অভ্যন্তরীণ নীতিতে তৃতীয় নেপোলিয়ন যতটা সফল, বিদেশনীতিতে তিনি ততটাই ব্যর্থ। ডেভিড টমসনের মন্তব্যটি এক্ষেত্রে যথাযথ, "The Second Empire, judged in terms of military glory or original achievement, was indeed only a pale shadow of the First (Empire).

৩.৮ তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের কারণ

তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের কারণ হিসেবে অনেকে তাঁর বিদেশনীতির ব্যর্থতাকেই সম্পূর্ণভাবে দায়ী করেন। কিন্তু সেডানের যুদ্ধ তাঁর অপসারণ ত্বরান্বিত করে থাকলেও সেটা পতনের প্রধান কারণ নয়। যুদ্ধে পরাজয়ের পরেও ফ্রান্সের ভৌগোলিক সীমা সঙ্কুচিত হয়নি বা প্রাশিয়া ফ্রান্সের প্রশাসনিক কাঠামোয় হস্তক্ষেপ করেনি। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পর যদি রাশিয়ার জার-এর পতন না হয়ে থাকে, তাহলে সেডানের যুদ্ধের পরই বা কেন দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটবে!

আসলে দেশের ভেতেরও, যুক্তিনিষ্ঠ জনমুখী শাসন চালানো সত্ত্বেও, তৃতীয় নেপোলিয়নের সমর্থনের দুর্গে ধস নেমেছিল। একই সঙ্গে অনেক শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। ফলে শেষ পর্যন্ত কোন শ্রেণীই

সন্তুষ্ট থাকেনি। প্রশাসনিক কেন্দ্রীকরণ করে প্রজাতন্ত্রীদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন, আবার দ্বিতীয় ধাপে উদারীকরণ করে কট্টর কেন্দ্রপন্থীদের অসন্তুষ্ট করেছিলেন। চার্চের পৃষ্ঠপোষণা করে বিপ্লবের উত্তরসূরীদের বিরক্ত করেছিলেন, আবার ইতালির জাতীয় আন্দোলনকে সমর্থন করে ক্যাথলিকদের সমর্থন হারিয়েছিলেন। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সুযোগে বুর্জোয়াদের একচেটিয়া হওয়ায় শ্রমজীবীরা ক্ষুব্ধ ছিল, আবার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন স্বীকৃতি পাওয়ায় মালিকগোষ্ঠী অসন্তুষ্ট হয়েছিল। এই সামগ্রিক অসন্তুষ্টির ধাক্কা সামলানো সেডানের পরাজয়ের পর আর সম্ভব ছিল না। তাই তৃতীয় নেপোলিয়নকে দেশ ছাড়তে হয়েছিল।

তাছাড়া ১৮৬০-এর পর ফ্রান্সের অভ্যন্তরে যখন তৃতীয় নেপোলিয়ন রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিয়েছিলেন এবং সংবাদ মাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করেছিলেন, সেই সময় ল্য সিয়েকল্ (Le Siecla) প্রভৃতি বহু পত্র-পত্রিকার পাতায় প্রজাতন্ত্রী নেতারা দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের তীব্র সমালোচনা শুরু করেন। তিয়ের (Thiers)-এর মতো মধ্যপন্থী এবং গাঁবেত্তার মতো চরমপন্থী—সকলেরই সমালোচনার লক্ষ্য ছিলেন তৃতীয় নেপোলিয়ন। আর এক সমালোচক ছিলেন ভিক্টর হুগো (Victor Hugo), যিনি নির্বাসনে বসে লিখেছিলেন 'পানিশমেন্ট' গ্রন্থটি। 'থ্রি জুল্স্' বলে চিহ্নিত তিন আইনজীবী জুল্স্ ফেরী, জুল্স্ সিম এর জুল্স্ ফারর তৃতীয় নেপোলিয়নকে প্রায় আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। এর ওপর ছিল বামপন্থী সমাজতন্ত্রীরা। এই প্রতিরোধ-এর সামনে এমনিতেই তৃতীয় নেপোলিয়ন অসহায় বোধ করছিলেন। সেডানের যুদ্ধে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাই তিনি দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

৩.৯ তৃতীয় নেপোলিয়ন : একটি মূল্যায়ন

শেষ বিচারে তৃতীয় নেপোলিয়ন একজন ব্যর্থ সম্রাট। তাই নানা সমালোচনা তাঁকে বিদ্ধ করেছে। রানী ভিক্টোরিয়া তাঁকে রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে মর্যাদা দিলেও কিংলেক বলেছেন রাজনৈতিক দুর্বৃত্ত, কার্ল মার্ক্স বলেছেন নির্বোধ আর ভিক্টর হুগো ব্যঙ্গ করে বলেছেন, 'ক্ষুদে নেপোলিয়ন'। সিম্যান তাকে বলেন দ্বিধাগ্রস্ত এবং অস্থিরচিত্ত। ".....his lack of ability to come to a clearcut decision about anything is the most pronounced feature of his character".

কিন্তু এতটা সমালোচনা বোধহয় তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রাপ্য নয়। অর্থনীতি ও সমাজনীতির দিক থেকে ফ্রান্সের জন্য যেসব পদক্ষেপ তিনি নিয়েছিলেন, তা ১৭৮৯-এর বিপ্লব ও প্রথম নেপোলিয়নের পর আর কখনো নেওয়া হয়নি। এই পদক্ষেপগুলোর যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন ডেভিড টমসন, "it has considerable importance for the material development of France and for the shaping of modern Europe." কিন্তু তবুও তৃতীয় নেপোলিয়কে অনেক সময়েই দুরভিসন্ধির মানুষ বলে মনে হয়েছে। আসলে ঐতিহাসিক লিপসনই ঠিক বলেছেন যে, বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও অব্যবস্থিতচিত্ত তৃতীয় নেপোলিয়ন কূটনৈতিক ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। সেই জাল কেটে তিনি বেরোতে পারেননি। তাই তিনি পরাজিত রাষ্ট্রনায়ক।

৩.১০ তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও প্যারি কমিউন বিদ্রোহ

সেডানের যুদ্ধে তৃতীয় নেপোলিয়নের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। সাময়িকভাবে জুল সিম (Jules Simon) ও জুল ফাবর-এর (JUles Fabra) নেতৃত্বাধীন মধ্যপন্থী প্রজাতন্ত্রী গোষ্ঠী এবং লিয়ঁ গাঁবেত্তার (Leon Gambetta) চরমপন্থী গোষ্ঠী যৌথভাবে ওতেল দ্য ভিল (Hotel de ville) থেকে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করে। লুই জুল ত্রশু-র (Louis Jules Trochu) নেতৃত্বে স্থাপিত হয় জাতীয় আত্মরক্ষার সরকার। ১৮৭১-এর ২৮ জানুয়ারি এই সরকার ভার্সাই-এর আরণি-মহলে (Hall of Mirrors) বিসমার্ক-এর সঙ্গে চুক্তি করে ফ্রান্সের পরাজয় মেনে নেয়। এরপর সীমিত নির্বাচনের মাধ্যমে ফ্রান্সে যে জাতীয় সংসদ গঠিত হয় এবং তার ভিত্তিতে তিয়ের-এর নেতৃত্বে যে তৃতীয় প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়, তারা ১ মার্চ ফ্রাংকফুর্টের সন্ধিতে জার্মানির হাতে ফ্রান্সের চরম অবমাননা মেনে নেয়। কিন্তু জার্মান সৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধ প্যারিসের শ্রমজীবী জনতা প্রজাতন্ত্র সরকারের বৈধতা মেনে নিতে অস্বীকার করে। শুরু হয় গৃহবিরোধ। তারই পরিণতিতে প্যারিস শহরে একটি বিদ্রোহী শাসন-সংস্থা বা শাসন-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাসে এটাই প্যারি কমিউন নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।

৩.১১ প্যারি কমিউনের প্রতিষ্ঠার পটভূমি

১৮৭১ সালের প্যারি কমিউনের প্রতিষ্ঠা ছিল ফ্রান্সের দীর্ঘদিনের বুর্জোয়া বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিণতি। ১৮৩০-এর দশক থেকেই প্রস্তুত হয়েছিল এর বাস্তব প্রেক্ষাপট। লুই ফিলিপের রাজত্বকাল (১৮৩০-১৮৪৮) সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় ক্রমশ প্রভাবিত শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে সমৃদ্ধ ছিল। ১৮৩১ সালে লিয়ঁর এবং ১৮৩৯ ও ১৮৪০ সালে পারির অভ্যুত্থান উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ১৮৪৮ সালের বিপ্লব। এই বিপ্লবের প্রথমদিকে উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা লুই ফিলিপের রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের দলে শ্রমিকদের নিয়ে নেয়। কিন্তু সশস্ত্র শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান শক্তিতে এরা ভীত হয়ে পড়ে এবং শেষ অবধি অবশিষ্ট সমস্ত শক্তির সহায়তায় শ্রমিকশ্রেণীকে দমন করে লুই নেপোলিয়ন বা তৃতীয় নেপোলিয়নকে সরকারি ক্ষমতা দখল করতে সাহায্য করে। এইভাবে ১৮৫২ সালে জন্ম হয় 'দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের'।

'দ্বিতীয় সাম্রাজ্যে'র আমলে ফ্রান্সের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি খুব দ্রুত হয়। ওখানকার পুঁজিপতিদের সমৃদ্ধিও খুব উল্লেখযোগ্য। পক্ষান্তরে ১৮৪৮ সালের দমন ও সাময়িক পরাজয় সত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণীকে স্তব্ধ করা সম্ভব হয় নি। মজুরি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক দাবির জন্য তাদের সংগ্রাম ক্রমেই প্রসার লাভ করে। পুলিশ, আদালত, সৈন্যবাহিনী প্রভৃতি পীড়নের যন্ত্র থাকা সত্ত্বেও সমগ্র ফ্রান্সে ধর্মঘট বিস্তৃতি লাভ করে। ১৮৬৮ সালে শ্রমিক, শ্রেণীর নিজস্ব সংগঠনের প্রসারও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৮৬৪ সালে ইতিমধ্যে স্বয়ং মার্কসের নেতৃত্বে সার্বজাতিক শ্রমিকসংস্থার প্রতিষ্ঠা হয় এবং তার প্রভাব ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেও বাড়তে থাকে।

'দ্বিতীয় সাম্রাজ' ফ্রান্সের উগ্র জাতীয়তাবাদে পুরোপুরি ইন্ধন যোগায় এবং 'প্রথম সাম্রাজ্যে'র (প্রথম নেপোলিয়নের অধীনে) সীমানা পুনরুদ্ধারের দাবি ওখানকার শাসকশ্রেণী তুলে ধরে। অর্থাৎ রাইন্ নদীর বাম তীরে জার্মানির অধীনে থাকা ভূমির জন্য দাবি করা হয়। স্পেনের সিংহাসনে প্রাশিয়ার রাজপুত্রের যে দাবি ছিল সে দাবি ইউরোপীয় ভারসাম্যের ক্ষতিকারক এই অছিলায় ফ্রান্স প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ১৮৭০ সালের ১৯ জুলাই।

যুদ্ধ ঘোষণার চারদি নপর 'সার্বজাতিক শ্রমিকসংস্থার সাধারণ পরিষদের প্রথম অভিভাষণে' শাসকশ্রেণীর যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকশ্রেণীর সার্বজাতিক কর্তব্যের কথা মার্ক্স মনে করিয়ে দেন পরিষদের সভ্যদের। মার্ক্সের 'প্রথম অইভভা,ণের' পূর্বেই ফ্রান্স ও জার্মানির শ্রমিকেরা তাদের সার্বজাতিক কর্তব্য পালন করতে শুরু করে দিয়েছিল। যুদ্ধ আরম্ভের প্রায় একটা সপ্তাহ পূর্ব থেকে উভয়দেশের শ্রমিকসংস্থাগুলি—বিশেষত নব প্রতিষ্ঠিত সার্বজাতিক শ্রমিকসংস্থার শাখাগুলি—প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেছিল যে এ যুদ্ধ শাসকশ্রেণীর যুদ্ধ, এ যুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। একদেশের শ্রমিকের সঙ্গে অপর দেশের শ্রমিকের কোনো শত্রুতা থাকতে পারে না, তারা পরস্পরের বন্ধু এবং বর্তমান যুদ্ধ এই বন্ধুত্বকে নষ্ট করার উদ্দেশ্যে শাসকশ্রেণীর ষড়যন্ত্র।

শ্রমিকশ্রেণীর তখনকার আপেক্ষিক শক্তির পক্ষে যুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। ফ্রান্সের পক্ষে এ যুদ্ধের ফলাফল সর্বনাশ হয়ে দেখা দেয়। সেপ্টেম্বরের দুই তারিখে ফরাসি সৈন্যবাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং তৃতীয় নেপোলিয়ন ক্ষমতাচ্যুত হন। চার তারিখে 'দ্বিতীয় সাম্রাজ্যে'র ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে প্যারিসের শ্রমিকরা সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করে। অন্যদিকে এক তথাকথিত 'জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকার' গঠিত হয়। এই সরকারের সভ্যরা ছিল অংশত রাজতন্ত্রী অংশত সাধারণতন্ত্রী এবং এদের মধ্যে রাজতন্ত্রীদের হাতে ছিল পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনী। যে সময় প্যারিসের দিকে প্রাশিয়ার সৈন্যরা এগিয়ে এসেছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব নেতৃবৃন্দ সরকারি জেলখানায় বন্দী সে সময় শ্রমিকেরা এই ব্যবস্থা মেনে নেয় শুধু একটি শর্তে যে নব প্রতিষ্ঠিত সরকার প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে বাঁচাবার লড়াই চালিয়ে যাবে। জার্মানদের দিক থেকে এই যুদ্ধ আর আত্মরক্ষার যুদ্ধ ছিল না। পরিণত হয়েছিল আক্রমণাত্মক যুদ্ধে।

ইতিমধ্যে প্যারিসের প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্য অস্ত্রধারণক্ষম সমস্ত নাগরিককে সশস্ত্র করা হয় এবং তাদের নিয়ে গড়ে ওঠে 'জাতীয় রক্ষী বাহিনী' যার মধ্যে শ্রমিকেরা ছিল সংখ্যাগুরু। তথাকথিত 'জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার' আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে কেননা তারা বুঝতে পারে যে প্রাশিয়ার আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ফরাসি শ্রমিকশ্রেণীর জয়লাভের অর্থ ছিল ফরাসি বিত্তবানদের বিরুদ্ধে ফরাসি শ্রমিকশ্রেণীর জয়লাভ। 'জাতীয় কর্তব্য এবং শ্রেণীস্বার্থের এই সংঘাতে জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকার এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে পরিণত হয় জাতীয় প্রতারণার সরকারে।' পরবর্তীকালে বিভিন্ন দলিল থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে এই সরকার প্রথম থেকেই প্যারিসের আত্মসমর্পণের বড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

নতুন সরকারের প্রথম কাজ ছিল শ্রমিকশ্রেণীকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা। তারা দাবি করে যে প্যারিসীয় রক্ষীবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি এবং যুদ্ধাবসানে রক্ষীবাহিনীর সেগুলিকে রাখার কোনো অধিকার নেই। কিন্তু এই দাবি ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। রক্ষীবাহিনীর লোকেরা নিজেরা চাঁদা তুলে ঐ অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেছিল এবং ২৮ জানুয়ারির আত্মসমর্পণের চুক্তিতে যেসব সরকারি অস্ত্রশস্ত্র প্রাশিয়ার হাতে তুলে দেওয়ার কথা হয় তার থেকে রক্ষীবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে বাদ দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ১৮ মার্চ তিয়ের্ তার সেনাপতির অধীনে এক সৈন্যবাহিনী পাঠায় জাতীয় রক্ষীবাহিনীর হাত থেকে কামান দখল করার জন্য। সেই থেকেই শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। অবশ্য রক্ষীবাহিনীর প্রতিরোধ এবং তাদের সঙ্গে সৈন্যবাহিনীর ভ্রাতৃসুলভ ব্যবহারের জন্য তিয়েরের এই প্রয়াস ব্যর্থ হয়। তিয়ের তার অনুচরদের নিয়ে পালিয়ে যান ভের্সাইয়ে। বিপ্লবীরা প্যারিসের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে এবং জাতীয় রক্ষীবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটি অস্থায়ী সরকারে পরিণত হন।

২৬ মার্চ প্যারিসে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন হয়। ২৮ মার্চ ঘোষিত হয় কমিউন এবং কেন্দ্রীয় কমিটি তার সমস্ত ক্ষমতা কমিউনের হাতে তুলে দেয়।

৩.১৩ প্যারি কমিউনের চরিত্র ও কার্যাবলী

ইউরোপের মধ্যযুগীয় কমিউন এবং ফ্রান্সের ১৭৯০-এর দশকের কমিউনের সঙ্গে ১৮৭১-এর কমিউনের কিছু আপাতসাদৃশ্য থাকলেও মূলে কিন্তু এদের মধ্যে কোন মিলই ছিল না। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সদ্য আবির্ভূত বুর্জোয়াশ্রেণীর লড়াই-এ মধ্যযুগীয় কমিউন হাতিয়ারের ভূমিকা নিয়েছিল সত্য, কিন্তু পরবর্তীকালে এই কমিউনই হয়ে দাঁড়িয়েছিল বুর্জোয়া রাষ্ট্র-ক্ষমতার ভিত্তি, যাকে ধ্বংস করা ছিল ১৮৭১-এর কমিউনের একটি প্রধান কাজ। আগের কমিউনের কাজ ছিল কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রকে বিকেন্দ্রীকৃত রাষ্ট্রতে পরিণত করা, কিন্তু এই কমিউন কখনই রাষ্ট্রক্ষমতা ধ্বংসের কথা ভাবেনি। কিন্তু পুরনো রাষ্ট্র-যন্ত্র অর্থাৎ তার সৈন্যবাহিনী, পুলিশ, আইন এবং আমলাতন্ত্র যে বিত্তবানদের হাতে বিত্তহীনদের শোষণযন্ত্র হিসাবে কাজ করে সে সম্পর্কে ১৮৭১-এর কমিউন প্রথম থেকেই সচেতন ছিল এবং এই কারণেই সে চেয়েছিল পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রের উত্তরাধিকারী না হয়ে তাকে ধ্বংস করতে। পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করার সঙ্গে সঙ্গে কমিউনকে লক্ষ্য রাখতে হয় যেন শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য থেকেই এমন এক গোষ্ঠী বেরিয়ে না আসে যারা পুরনো শোষণ-যন্ত্রের জায়গায় নতুন এক শোষণযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করবে। এই দ্বৈত কর্তব্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কমিউন প্রথমেই কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করে। স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর অবসান ঘটিয়ে তার জায়গায় দাঁড় করায় সশস্ত্র জনগণকে। আইন, শিক্ষা এবং প্রশাসনের ক্ষেত্রে প্রতিটি পদের জন্যই জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচন প্রথা চালু করা হয় এবং স্থির করা হয় যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নির্বাচকরা যে কোনো সময়ে ডেকে পাঠিয়ে পদচ্যুত করতে পারেন। কমিউনের সভ্য থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি পদাধিকারীকে

বেতন দেওয়া হয় সাধারণ শ্রমিকের গড়পড়তা মজুরির হারে। শ্রমিকশ্রেণীর আর একটি বৈশিষ্ট্যও—সার্বজাতিকতা —প্রথম থেকে কমিউনের কাজে প্রকাশ পায় ফরাসি এবং বিদেশীদের মধ্যেকার রাজনৈতিক পার্থক্য ঘুচিয়ে দিয়ে কমিউন এদের সমান রাজনৈতিক অধিকার স্বীকার করে। বস্তুত কমিউনসভ্য এবং শ্রমমন্ত্রী ছিলেন এক হাঙ্গেরীয় এবং তার প্রথম সারির সেনাপতিদের মধ্যে ছিল দুইজন পোলদেশীয়।

রাজনৈতিক দিক ছাড়াও সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে কমিউন সমভাবে বিপ্লবী ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করে দেওয়া হয় এবং ধর্মীয় সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্ত করে ধর্মযাজকদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাদের যার যার ব্যক্তিগত জীবনে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে ধর্ম এবং রাষ্ট্র এই উভয়ের আওতা থেকে মুক্ত করার পর সেখানে জনসাধারণের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়। রুটি তৈরির কারখানায় রাত্রির কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। শ্রমিকদের উপর মালিকের জরিমানা বসানো নিষিদ্ধ করা হয় এবং বন্ধ কলকারখানা শ্রমিক সমবায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এইভাবে প্যারিসীয় আন্দোলনের শ্রেণীচরিত্র স্পষ্ট ফুটে ওঠে। শ্রমিকরা বা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কমিউনে অংশগ্রহণ করার ফলে কমিউনের সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রলেতারীয় রূপ গ্রহণ করে।

৩.১৩ প্যারি কমিউনের পতনের কারণ

কিন্তু বিপুল আশা ও উদ্দীপনা জাগিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেও কমিউন স্থায়ী হয়েছিল মাত্র ৭২ দিন, তিয়েরের (Thiers) বুর্জোয়া সরকারের হাতে এর পতন ঘটেছিল ২৮ মে। স্বভাবতই শ্রমজীবী শ্রেণীর এই অভূতপূর্ব প্রচেষ্টা কেন অত অল্পদিনের মধ্যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল, ইতিহাসবিদ্‌দের কাছে এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

প্যারিসে কমিউনের দ্রুত পতনের কারণ হিসেবে ঐতিহাসিকেরা প্রথমেই যে বিষয়টির উল্লেখ করেন, তা হল প্রশাসনিক ও প্রতিরক্ষামূলক দায়িত্বের ভাগবাঁটোয়ারায় কমিউনের অন্তর্বিরোধ। কমিউন প্রতিষ্ঠার পর পরই নবগঠিত পরিষদের ওপর প্রশাসনিক দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে রক্ষীবাহিনীর সেন্ট্রাল কমিটি রাজনীতি থেকে দূরে সরে আসার কথা ঘোষণা করেছিল। তারা আরো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তারা সবসময়েই কমিউন পরিষদের প্রতি অনুগত থাকবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, পরিষদকে অগ্রাহ্য করে সেন্ট্রাল কমিটির (Public Proclamations) জারি করছে, সামরিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করছে এবং বিভিন্ন সাব-কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রশাসনের নিম্নস্তরেও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার চেষ্টা করছে। সেন্ট্রাল কমিটির এই ধরনের আচরণের ফলে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত কমিউন-পরিষদ পুরো প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দায়িত্বপালনের কোনো সুযোগই পায়নি।

প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণের পরও পরিষদ পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রের উত্তরাধিকার অস্বীকার করতে চেয়েও বিচার ও শিক্ষাক্রমের ক্ষেত্রে পুরনো কাঠামোই বজায় রাখে। ফলে বিপ্লবী মূল্যবোধ ও চেতনা সৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। যদিও কারখানার রাত্রিকালীন শ্রমব্যবহারের ওপর নিয়ন্ত্রণ, স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর বিলোপ ও সশস্ত্র নাগরিকদের দ্বারা তার স্থানপূরণ, সরকার থেকে ধর্ম ও চার্চের পৃথকীকরণ, শ্রমিকদের মজুরিহ্রাসের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি, বন্ধকী প্রতিষ্ঠানসমূহের অপসারণ, বন্ধ কলকারখানা প্রাক্তন শ্রমিকদের সমবায় সমিতির দ্বারা পরিচালনার ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় নিয়োগকেন্দ্রের মাধ্যমে কর্মে নিযুক্তি—ইত্যাদি কতকগুলো সংস্কার কমিউন করেছিল। কিন্তু এগুলোর কোনোটিই আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন আনবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। কেন কমিউন পরিষদ যথেষ্ট মৌলিক সংস্কারে ব্যর্থ হয়েছিল—এই প্রশ্নের উত্তরে সাধারণভাবে দুটো প্রধান কারণের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত প্যারি কমিউন কোনো নির্দিষ্ট আদর্শ ও সুসংহত নেতৃত্বের অধীনে ছিল না। কমিউন পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেছিল বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন চার্লস দেলেস-ক্লুজ্ (Charles Delescluze) এবং ফেলিক্স প্যাটের (Felix Pyat) এর মত জ্যাকোবিনরা, সেঁ সিমঁ (St. Simon) এবং ফুরিয়েরের (Fourier) অনুগামী সমাজতন্ত্রীরা, লুই ব্লাঁ (Blanc) স্বয়ং এবং প্রুধোঁর (Proudhon) শিষ্যরা। এছাড়াও ছিলেন লিও ফ্র্যাংকেল (Frandkel) এবং এদুয়ার ভেইয়াঁর (Eduard Villart) মত মার্কসবাদী কমিউনিস্টরা। স্বাভাবিকভাবেই উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে এদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল অনিবার্য এবং এরই ফলে কমিউন নেতৃত্ব কোনো সুচিন্তিত সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, কমিউন নেতৃত্বের বিপ্লবী চেতনাও তখনো পর্যন্ত খুব একটা স্বচ্ছ ছিল না। তারা বুঝতে পারেনি যে, প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রতন্ত্র সরাসরি দখল করে তারপর তা পুরোপুরি অস্বীকার করা বা বদলে দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত আমলাতান্ত্রিক কাঠামো তারা সম্পূর্ণ ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেও সফল হয়নি এবং এটাও ছিল কমিউনের চূড়ান্ত ব্যর্থতার একটা অন্যতম কারণ।

সংস্কার পরিকল্পনার ব্যর্থতা, পরিচালন-পরিষদের অন্তর্বিরোধ পরস্পরবিরোধী বক্তৃতা ও অর্থহীন আইন প্রনয়ণে কালক্ষেপ ইত্যাদি কারণে কমিউন ক্রমশই সাধারণ জনমানসে অপ্রিয় হয়ে পড়ে। ১৬ই এপ্রিলে অনুষ্ঠিত সম্পূরক নির্বাচনে (Supplementary election) সীমিত সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ থেকেই সাধারণ মানুষের কমিউন পরিষদ সম্পর্কে হতাশার ছবি স্পষ্ট হয়ে যায়। মোট বিধিবদ্ধ নির্বাচনকারীদের মাত্র ১২% শতাংশ এই নির্বাচনে ভোট দেয় এবং ৩১টি শূন্য আসনের মধ্যে মাত্র ২১টি আসনে প্রতিনিধি নির্বাচন সম্ভব হয়।

একদিকে যখন খোদ প্যারিস শহরেই কমিউন জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে, অন্যদিকে তখন কমিউন নেতৃত্ব ফ্রান্সের অন্যান্য প্রদেশ বা শহরের সমর্থন আদায়েও ব্যর্থ হয়। ৬ এপ্রিল কমিউনের পক্ষ থেকে প্রচারিত একটি ঘোষণার মাধ্যমে—"কমিউন শুধু একটি সংকীর্ণ স্বার্থগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে",—ভার্সাই সরকারের এই জাতীয়

বিবৃতির বিরোধিতা করে কমিউন সম্পর্কে সত্য প্রচার চালাবার উদ্দেশ্যে কর্মীদের বিভিন্ন প্রদেশে পাঠানো হয়। ১৯ এপ্রিল কমিউন "Declaration of the French people" নামক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনে কমিউনের নিজস্ব সাংগঠনিক চরিত্রের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় এবং ঘোষণা করা হয় "প্যারিস সংগ্রাম করছে গোটা ফ্রান্সের জন্য। এর ত্যাগ তিতিক্ষা ও লড়াই-এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল গোটা ফ্রান্সের প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক নৈতিক ও আত্মিক উন্নয়ন।" প্রতিবেদনের শেষ অংশে ফ্রান্সের জনগণের উদ্দেশ্যে 'ভার্সাইকে নিরস্ত্র ও পরাজিত করার আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু এইসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ফ্রান্সের অন্যান্য প্রদেশ বা শহর প্যারি কমিউনকে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানায়নি বা ১৫ই মে সশস্ত্র লড়াই-এর জন্য তার আবেদনেও কোনো সাড়া দেয়নি। কমিউন ক্রমশই ফ্রান্সের অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গ্রামীণ কৃষকসমাজের সঙ্গেও তার কোনো মৈত্রী স্থাপিত হয়নি। এই ব্যাপক গণসমর্থনের অভাবই তাকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে তোলে।

সংগঠনের চরমতম সংকটের সময়েও কমিউন নেতৃত্ব ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। ১৬ই এপ্রিলের নির্বাচনের পর প্রধানত জ্যাকোবিন গোষ্ঠীর শক্তিবৃদ্ধি ঘটে এবং তারা সংখ্যালঘু নেতৃত্বকে অগ্রাহ্য করতে শুরু করে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে কমিউন পরিষদ কার্যত অকর্মণ্য হয়ে যায় এবং নেতৃত্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ "Committee of public Safety" নামে একটি সংগঠন তৈরি করে। সংখ্যালঘু অংশ প্রকাশ্যে এর সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে এবং পরিষদের সভায় যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ইতিমধ্যে ভার্সাই বাহিনীর হাতে গুরুত্বপূর্ণ ইজি (Issy) দুর্গের পতন ঘটে এবং এই সময়ে "কমিটি অব পাবলিক সেফ্‌টি" ভেঙে দেওয়া হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পাল্টা সংগঠনের প্রতিষ্ঠা, নেতৃত্বের তীব্র মতবিরোধ ও পারস্পরিক দোষারোপের প্রবণতা কমিউনকে দ্রুত পতনের পথে নিয়ে যায়।

কমিউন নেতৃত্বের এই সংকটের ফলে প্যারিসে কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়নি বা প্যারিসের প্রতিরক্ষার জন্য উপযুক্ত রণকৌশল নির্ধারণ ও সামরিক প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হয়নি। পরিষদ বুঝতে পারেনি যে, ভার্সেইকে অবিলম্বে আক্রমণ করার ওপর কমিউনের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। পরিষদ 'ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স' দখল করেনি, যা হয়তো কমিউনের বিজয়ের সবচাইতে বড় হাতিয়ার হতে পারত। ফলে তিয়ের সময় পেরেছিলেন তাঁর দুর্বল বাহিনীকে সংহত করার। ১৮ মার্চের জয়ের পর জাতীয় রক্ষা বাহিনী সরকারি পুলিশবাহিনীকে বন্দী ও নিরস্ত্র না করে তাদের ভের্সাইয়ে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল। এপ্রিলের শেষ দিক থেকে তিয়ের প্যারিস আক্রমণ করতে শুরু করেন। কিন্তু প্যারিসের রক্ষীবাহিনীর সেনাপতিরা প্রায় দায়িত্বজ্ঞানহীন ছিলেন বলা যেতে পারে। সুতরাং সরকারি বাহিনী যখন প্যারিস অবরোধ করে, তখন প্যারিসের রক্ষীবাহিনী প্রকৃত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। ১৬ই মে প্যারিসের প্রাচীরের একটি অরক্ষিত অংশ দিয়ে সরকারি বাহিনী প্যারিসে প্রবেশ করে। ২৮ মে প্যারি কমিউনের পুরোপুরি পতন ঘটে।

৩.১৪ কমিউনের তাৎপর্য

কিন্তু এই পরাজয়ই কমিউনের শেষ কথা নয়। কমিউন পরাজিত হলেও যে আদর্শ নিয়ে তার জন্ম হয়েছিল, তা অপরাজিতই থেকে যায়। কমিউন তার স্বল্পকালীন অস্তিত্বে যে শিক্ষা রেখে গিয়েছিল, শ্রমিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে তার মূল্য ছিল অপরিসীম।

মার্ক্স তাঁর Civil War in France নামক রচনায় প্যারি কমিউনকে কেন্দ্রীকৃত জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতের প্রোলেতারীয় বিপ্লবের আদর্শ হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। ডেভিড টমসন এই মতের সমালোচনা করে কমিউনের প্রোলেতারীয় চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অন্য কোন কোন ঐতিহাসিক প্যারি কমিউনের অতটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নন। কমিউনের চরিত্রে অস্বচ্ছতা ও স্ববিরোধী প্রবণতা থাকতেই পারে, কিন্তু তবুও ১৮ই মার্চের বিখ্যাত ঘোষণা কমিউনের আদর্শকে ইতিহাসে অম্লান করে রেখেছে। ঘোষণাটি ছিল : "শাসকশ্রেণীর ব্যর্থতা ও বিশ্বাসঘাতকতার মুহূর্তে প্যারিসের সর্বহারা শ্রেণী উপলব্ধি করেছে যে, তাদের নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গঠন করার অঙ্গীকার নিয়ে সরকারি ক্ষমতা ও রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করে নেওয়ার সময় এসে গেছে।" মূলত প্যারি কমিউন ছিল এই অঙ্গীকারেরই ফলশ্রুতি।

রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাব, রণকৌশলের অনভিজ্ঞতা ও সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে কমিউন ভেঙে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তবুও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যের বিচারে ইতিহাসে তা আজ্ঞে বেঁচে আছে। মার্ক্স বলেছিলেন, যা করেছিল তা দিয়ে কমিউনের বিচার না করে যা করতে চেয়েছিল তাই দিয়ে তার বিচার করা উচিত। জে. টি. জোযিনের (J. T. Joughin) মতে, কমিউনের সত্যিকারের তাৎপর্য প্রতিফলিত হয়েছে। পরবর্তী বিপ্লবের ইতিহাসে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শে কমিউন সংগঠিত না হলেও পরবর্তী প্রজন্মের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ প্রস্তুতিতে এর ভূমিকা ছিল অসাধারণ। ফ্রাঁকোয়া গেয়াগেল (Francois Goguel) শ্রমিক আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান চরমপন্থী ঝোঁকে কমিউনের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন, মাসৌ (E. S. Masou) কুড়ি শতকের সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের কাজের মধ্যে কমিউনের তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছেন এবং ফ্রাঙ্ক জেলিনেক (Frank Jellinek) বিপ্লবীতত্ত্বের প্রসারে কমিউনের প্রকৃত অবদানের সম্মান করেছেন। স্বয়ং লেনিন তাঁর বিপ্লবীতত্ত্ব ও দল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কমিউন থেকে মূল শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বলে স্বীকার করে গেছেন।

পরাজয়ের মধ্য দিয়েই কমিউন আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিল যে, বিপ্লবের যুগ শেষ হয়ে যায়নি, সার্থক প্রস্তুতি থাকলে শ্রমজীবীদের আন্দোলন সফল হতে বাধ্য। এই ঐতিহাসিক শিক্ষার মধ্যেই নিহিত ছিল প্যারি কমিউনের প্রকৃত বিজয়।

৩.১৫ সারসংক্ষেপ

১৭৮৯-এর ফরাসি বিপ্লবের পর সামরিক শক্তির ওপর ভিত্তি করে যে সব শক্তিশালী রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছিল তৃতীয় নেপোলিয়র দ্বিতীয় সাম্রাজ্য সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। ১৮৪৮-এর ফ্রেব্রুয়ারি বিপ্লব যে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র স্থাপন করে, সেই প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লুই বা তৃতীয় নেপোলিয়ন। অভ্যন্তরীণ শাসনে কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও তিনি কিন্তু বিদেশ নীতিতে ছিলেন ব্যর্থ। ১৮৭০-এ সেডানের যুদ্ধে প্রাশিয়ার কাছে হেরে গিয়ে তিনি ইংল্যান্ডে চলে যান, সেই সঙ্গে ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটে। একই সঙ্গে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হয় তৃতীয় প্রজাতন্ত্র তারা প্যারিসে প্যারি কমিউন। ছ সপ্তাহ পর অবশ্য প্যারি কমিউনের পতন ঘটে এবং তৃতীয় প্রজাতন্ত্র টিকে যায়।

৩.১৬ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন :

১। দ্বিতীয় ফরাসি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তৃতীয় নেপোলিয়নের অভ্যন্তরীণ শাসনকাঠামো কেন্দ্রীভূত ছিল কি? এই শাসনের গঠনমূলক বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?

২। তৃতীয় নেপোলিয়নের বিদেশনীতির লক্ষ্য কি ছিল? ঐ লক্ষ্য অর্জন করতে গিয়ে ফরাসি সম্রাট ফ্রান্সকে মিত্রহীন করে দিয়েছিলেন কি?

৩। তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের কারণ কি? তার কাজের মূল্যায়ন করুন।

৪। ফ্রান্সে প্যারি কমিউনের প্রতিষ্ঠার পটভূমি আলোচনা করুন।

৫। প্যারি কমিউনের পতন হয়েছিল কেন?

ছোট প্রশ্ন :

১। 'জুন ডেজ' (June Days) বলতে কি বোঝায়?

২। লুই নেপোলিয়নকে তৃতীয় নেপোলিয়ন বলা হত কেন?

৩। তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময়ে বিপুল জনসমর্থনের কারণ কি ছিল?

৪। লুই নেপোলিয়নের 'international showmanship' বলতে কি বোঝায়?

৫। আঠারো শতকের কমিউনের সঙ্গে উনিশ শতকের কমিউনের চারিত্রিক পার্থক্য কি?

৬। প্যারি কমিউনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। ফরাসি 'জাতীয় সভা'কে মার্ক্স-এঙ্গেলস কিভাবে অভিহিত করতেন?

২। লুই নেপোলিয়নের বংশপরিচয় কি ছিল?

৩। তৃতীয় নেপোলিয়ন কোথায় কোন দুর্গে বন্দী হয়েছিলেন?

৪। 'এমস্ টেলিগ্রাম' কি?

৫। দ্বিতীয় ফরাসি সাম্রাজ্যের কয়েকটি ঋণদানকারী সংস্থার নাম করুন।

৬। তৃতীয় নেপোলিয়নকে 'ক্ষুদে নেপোলিয়ন' কে বলেছিলেন?

৭। 'বোনাপার্ট-মিথ' কি?

৮। কবডেন চুক্তি, কাদের মধ্যে কেন সম্পাদিত হয়?

৯। ম্যাক্সিমিলিয়ঁ কে ছিলেন?

৩.১৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। E. Lipson : Europe in the 19th and 20th Centuries.

২। Stephen Lee : Aspects of European History, 1789-1950.

৩। Alfred Cobban : A History of Modern France, 1799-1945.

৪। David Thomson : France-Empire and Republic.

৫। J. F. Joughin : Paris Commune in French Politics.

একক ৪ □ বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্রের গঠন—ইতালি ও জার্মানী ; পুরনো অস্ট্রিয় ও অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্যের ভাঙন

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ ঐক্যবদ্ধ ইতালি-সৃষ্টির পটভূমি ও যোশেফ মাৎসিনি

৪.৪ যোসেফ মাৎসিনি

৪.৫ কাউন্ট কভুর

৪.৬ গ্যারিবল্ডি

৪.৭ মূল্যায়ন

৪.৮ বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে জার্মানির সংগঠন প্রস্তুতি

৪.৯ অটো ফন বিসমার্ক

৪.১০ জার্মান উদারপন্থীদের ভূমিকা

৪.১১ বিসমার্কের "রক্ত ও লৌহ" নীতির প্রয়োগ এবং জার্মান ঐক্য

৪.১২ মূল্যায়ন

৪.১৩ অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য ভাঙন

৪.১৪ তুর্কী সাম্রাজ্যের ভাঙন

৪.১৫ সারসংক্ষেপ

৪.১৬ অনুশীলনী

৪.১৭ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উদ্দেশ্য

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপে একদিকে যে বৃহৎ রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ আর অন্যদিকে যে পুরনো সাম্রাজ্যের ভাঙন দেখা দিয়েছিল, তার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়াই বর্তমান এককের উদ্দেশ্য।

৪.২ প্রস্তাবনা

১৮৭০-এর দশকের গোড়ায় যখন তৃতীয় ফরাসি প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই সময়েই ইতালি ও জার্মানিতে গড়ে ওঠে দুটো বড় ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র। আবার এতদিন ধরে টিকে থাকা অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ সাম্রাজ্য আর অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্য এইসময়ে দুর্বল হয়ে পড়ে, ভাঙতে শুরু করে। এই ভাঙা-গড়ার একটি বিবরণ ও বিশ্লেষণের উপস্থাপনা করা হবে বর্তমান এককে।

৪.৩ ঐক্যবদ্ধ ইতালি সৃষ্টির পটভূমি ও যোশেফ মাৎসিনি

আঠারো শতকের ইউরোপে ইতালি নামে কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। এখন যে রাষ্ট্রটি ইতালি নামে পরিচিত, তার উত্তর দিকটিতে শাসন করত অস্ট্রিয়া, দক্ষিণ দিকটিতে ছিলেন ফরাসি বুরবোঁ রাজারা। মধ্যাংশটিতে ছিলেন পোপ। এর মধ্যে শুধু পিডমন্ট-সার্ডিনিয়া সীমিত স্বায়ত্বশাসনের অধিকারী ছিল। উনিশ শতকের গোড়ায় এই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডের অধিবাসীদের মনেও জাতীয় রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা জাগে। এর প্রথম কারণ ফরাসী বিপ্লব। এই বিপ্লব ইতালিকে দিয়েছিল 'The inspiring concept of a nation as a comity of nations'। দ্বিতীয় কারণ, নেপোলিয়নের অভিযান। হ্যাপ্‌সবুর্গ ও বুরবোঁদের তাড়িয়ে দিয়ে, সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে, পোপকে ক্ষমতাহীন করে, খণ্ড-বিখণ্ড রাজ্যগুলোকে নেপোলীয়নীয় কাঠামোর মধ্যে এনে ফরাসি সম্রাট ইতালিবাসীদের ঐক্যের স্বাদ দিয়েছিলেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মনে যে ক্রমশ জাতীয়তাবাদী চেতনা অঙ্কুরিত হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল 'কনসিলিয়েটর' পত্রিকার পাতায়। ঐতিহাসিক শান্টু (Cantu), ত্রজা (Troya) ও ক্যাপ্পানি (Cappani) ভাষাবিদ তোম্মাসিও (Tommacio), ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক দ্য জেগ্‌লিও (Massimo d, Azeglio), সংস্কৃতিজীবী লিওপার্ডি (Leopardi) মানজোনি (Manzoni), বার্চেট (Barchet), সিলভিও পেলিকো (Silvio Pellico), গ্যিস্তি (Guisti)—এঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের রচনা আর সংস্কৃতিচর্চার মাধ্যমে মানুষকে জাতীয় চেতনায় দীক্ষিত করতে শুরু করেছিলেন। যেসব বুদ্ধিজীবী—ইতালি ছেড়ে প্যারিসে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তারা সেখান থেকেই উদারনীতি আর জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা প্রচার করেছিলেন।

এইভাবে একদিকে যখন ইতালিয়রা নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ সেই সময়ে তাদের ওপর চেপে বসেছিল ভিয়েনা ব্যবস্থার স্বৈরাচার। ফলে প্রতিবাদী জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী গোষ্ঠীর জন্ম হতেও দেরি হয়নি। স্বৈরাচারী মেটারনিখীয় প্রতিবন্ধকতার কারণেই এই গোষ্ঠীগুলো গুপ্ত সমিতির চেহারা নিয়ে বেড়ে ওঠে।

৪.৪ যোসেফ মাৎসিনি

কার্বোনারি ছিল এই রকমই একটি গোপন সংগঠন। এই সংগঠনেই জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হন যোসেফ মাৎসিনি (Giuseppe Mazzini)। গ্যেটে, বায়রন, দাতঁর গুণমুগ্ধ রোমান্টিক ভাবাদর্শে আপ্লুত মাৎসিনি ইতালির গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে খুঁজেছিলেন দাঁত ও মাকিয়াভেলির লেখার মধ্যে। উদারনীতি আর জাতীয়তাবাদ ছিল তাঁর প্রধান আদর্শ। বাকুনিনের নৈরাজ্যবাদ বা মার্ক্সের সমাজতত্ত্ব তাঁর পছন্দ হয়নি। কিন্তু শ্রমজীবীদের জন্য তাঁর উৎকণ্ঠা ছিল। সাধারণ মানুষের মুক্তি ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষিত। রোমকে তিনি "Terza Rome" বা, তৃতীয় রোম হিসেবে গড়তে চেয়েছিলেন। 'প্রথম রোম' ছিল সিজারের, 'দ্বিতীয় রোম' ছিল পোপ এর 'তৃতীয় রোম' হিসেবে গড়তে চেয়েছিলেন। 'প্রথম রোম' ছিল সিজারের, 'দ্বিতীয় রোম' ছিল পোপ-এর 'তৃতীয় রোম' হবে জনতার, এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। ধর্মানুভূতি থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেননি ঠিকই। এমনকি একসময়ে 'ধর্মস্থাপনার' জন্যই তিনি পিডমন্টের রাজা চার্লস এ্যালবার্ট বা পোপ নবম পাইয়ুসকেও আহ্বান জানিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ধর্মবোধ বা আত্মিক সাধনা পুরোপুরি ঈশ্বর নির্ভর নয়, তা ছিল ইতালিয়দের আত্মিক নবজন্মের (Risorgimento) প্রয়াস। ১৮২০-র দশকের সংগ্রামের ব্যর্থতায় হতাশ মাৎসিনি মার্সেইতে ১৮৩০-এ 'ইয়ং ইতালি' (Giovine Italia) দল গঠন করেন। দলে দলে যুবক সম্প্রদায় 'ইয়ং ইতালির সদস্যপদ গ্রহণ করে। ১৮৩০ সালে পিডমন্টের গণ অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলে মাৎসিনি দেশবাসীকে বলেন তারা যেন ভবিষ্যতে সমগ্র ইটালি ছাড়া কোন বিচ্ছিন্ন অংশের জন্য আন্দোলন না করেন। মাৎসিনি গভীর ভাবে প্রজাতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাস করতেন। তাঁর পরিকল্পনায় ভবিষ্যতের ঐক্যবদ্ধ ইতালি প্রজাতান্ত্রিক ছাড়া অন্য কিছু হবে না। দেশপ্রেম তিনি ধর্মের পর্যায়ে উন্নীত করেন। মাৎসিনি শেষ পর্যন্ত সফল হননি। প্রজাতান্ত্রিক ঐক্যবদ্ধ ইতালি তিনি দেখে যেতে পারেননি। হয়ত তাঁর অতিরিক্ত ভাবাবেগ, বাস্তব-বিমুখতা এর কারণ ছিল। জ্যাক ড্রজ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন "This great Patriot....had no political genius...."। হবসবম তাঁর সম্পর্কে আরও তীক্ষ্ণভাষী, "The woolly and ineffective self-dramatizer"। কিন্তু এই তিরস্কার নিতান্তই অবাঞ্ছিত। সম্ভবত মার্কসকে গ্রহণ করেননি বলেই এঁরা রেগে গিয়েছেন, কিন্তু মনে রাখা দরকার, শূন্য থেকে শুরু করেছিলেন মাৎসিনি আর রেখে গিয়েছিলেন এমন এক ইতালিকে, যে ইতালিতে, তাঁর কথামতো, ১৮৪৮-এর বিপ্লবের দিনগুলোতে রাজাদের যুদ্ধের শেষ, প্রজাদের যুদ্ধের শুরু'। আর তিনি রেখে গিয়েছিলেন তাঁর মন্ত্রশিষ্য গ্যারিবল্ডিকে। ইতালির ঐক্য আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন মাৎসিনি। এই প্রস্তুতি না থাকলে কাভুর তাঁর কূটনৈতিক খেলায় (diplomatic game) কতটা সফল হতেন, সন্দেহ।

১৮৪৮-র ইতালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অল্প সময়ের মধ্যেই ঝিমিয়ে পড়েছিল। ইতিমধ্যে পোপের নেতৃত্ব নতুন করে প্রতিষ্ঠা করার একটা চেষ্টাও কারো কারো মধ্যে দেখা গিয়েছিল। মধ্যযুগীয় পোপপন্থী গুয়েলফ (Guelf) ঐতিহ্যকে মাথায় রেখে রাজানুগতদের বিপরীতে (মধ্যযুগে এদের বলা হত গিবেলিন, Ghibeline)

পাদ্রী জিওবার্টি (Gedberti) পোপকেই জনতার নেতা হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এইরকম পরিস্থিতিতে মাৎসিনির অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন পিডমন্টের প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট কাভুর (Count Cavour)।

৪.৫ কাউন্ট কাভুর

কাভুর প্রজাতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন, একথা পুরোপুরি ঠিক নয়। তবে মাৎসিনির মতো প্রজাতন্ত্রের প্রতি রোমান্টিক আবেগ তিনি দেখাননি। বাস্তববাদী কাভুর প্রকাশ্যে ঐক্যবদ্ধ সংসদীয় ইতালি গড়ার কথা বলে চার্চপন্থী, রাজতন্ত্রী ইত্যাদি সবার সহযোগিতাই চেয়েছিলেন এবং প্রয়োজনে বিদেশী সাহায্যও নিতে প্রস্তুত ছিলেন। ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য অস্ট্রিয়াকে জোর করেই সরাতে হবে, একথা তিনি মনে করতেন এবং এও বিশ্বাস করতেন যে, নেতৃত্ব দিতে হবে পিডমন্টকেই। পিডমন্টকে তাই তিনি আধুনিক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি জানতেন ভিয়েনা-ব্যবস্থাকে নষ্ট করবার জন্য ফরাসি সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন উন্মুখ। তাই তিনি অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ফ্রান্সকে সঙ্গে রাখতে চেয়েছিলেন। সেইসঙ্গে কাবুর তাঁর সম্পাদিত 'ইল রিজর্গিমেন্টো (Il Risorgimento) পত্রিকার মাধ্যমে ইতালির আঞ্চলিক শাসকদের কাছে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

১৮৪৮ সালে জাতীয়তাবাদের ব্যর্থতা দেখে কাভুরের দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে বিদেশী সাহায্য ছাড়া ইতালির অস্ট্রিয়া-বিরোধিতা সফল হবে না। তাই তিনি আন্তর্জাতিক গুরুত্ব পাওয়ার আশায় একরকম অসঙ্গত ও অনাহূত ভাবেই ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পিডমন্ট-সার্ডিনিয়ার সেনা পাঠান। যুদ্ধে তাঁর সেনারা বীরত্ব প্রদর্শন করায় সন্ধি-আলোচনায় প্যারিসে কাভুর আমন্ত্রণ পান। সেখানে ইতালির জাতীয়তাবাদী চেতনা ও অস্ট্রিয়ার অন্যায় কর্তৃত্বের কথা তিনি বলার সুযোগ পেয়ে যান। বিশেষ করে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের আনুকূল্য অর্জিত হয়। ১৮৫৮ সালে ফ্রান্স ও পিডমন্ট-সার্ডিনিয়ার মধ্যে সম্পাদিত হয় প্লমবিয়ার্সের চুক্তি (Compact of Plombiers)। চুক্তিটি ছিল অস্ট্রিয়া-বিরোধী। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জিততে পারলে পিডমন্ট-সার্ডিনিয়া লম্বার্ডি, ভেনিসিয়া, মোডেনা ও পোপ-রাজ্যের কিছুটা নিয়ে উত্তর ইতালিয় রাষ্ট্র গঠিত হবে বলে ঠিক নয়। ফ্রান্স পাবে স্যাভয় এবং নিস। অস্ট্রিয়া যুদ্ধে রাশিয়ার নিরপেক্ষতাও নিশ্চিত করা হয়। ইংল্যান্ড ফরাসি-বিরোধী হলেও ইতালিয় জাতীয়তাবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। তাছাড়া অস্ট্রিয়ার দুর্দশায় প্রাশিয়ারও খুশি হওয়ার কথা। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণতই কাভুরের পক্ষে চলে এসেছিল। প্লমবিয়ার্সের চুক্তি ছিল কাভুরের কূটনৈতিক চাতুর্যের অন্যতম উদাহরণ।

এরপর কাভুর অস্ট্রিয়াকে উত্তেজিত করবার জন্য সীমান্তে ব্যাপক সমরসজ্জা শুরু করেন। অধৈর্য অস্ট্রিয়ারাজ ফ্রানড্ জোসেফ কাভুরের ফাঁদে পা দেন। অস্ট্রিয়া একটি চরমপত্র দিয়ে পিডমন্টকে ভয় দেখালে

সেটাই যুদ্ধের অজুহাত হিসেবে গৃহীত হয় এবং যুদ্ধ শুরু করেন। চুক্তি অনুযায়ী ফ্রান্স যুদ্ধে যোগ দেয়। পিডমন্ট-ফরাসী যুগ্মবাহিনী ম্যাজেন্টা ও সলফেরিনোর যুদ্ধে জয়ী হয়। লম্বার্ডি থেকে অস্ট্রিয়াকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। পার্মা, মোডেনা, ফ্লোরেন্স ও বোলনে বিদ্রোহ শুরু হয়। কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ ফ্রান্স যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়িয়ে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে 'ভিঅআফ্রাংকা'-র সন্ধি (১৮৫৯) করে। সম্ভবত, ফ্রান্সের পাশে শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ ইতালির অভ্যুদয়ের আতঙ্ক, যুদ্ধে অপরিমিত লোকক্ষয় ও ফরাসি ক্যাথলিকদের পোপ-এর প্রতি সমর্থন—এই সব কারণেই তৃতীয় নেপোলিয়ন পিছিয়ে এসেছিলেন। ফ্রান্স চুক্তিভঙ্গ করায় ক্যাভুরের আপত্তি স্বত্ত্বেও পিডমন্টরাজ অন্যানুয়েল অস্ট্রিয়ার সঙ্গে জুরিখের সন্ধি করে যুদ্ধের অবসান ঘটান। সার্ডিনিয়া শুধু লম্বার্ডি পায়, ভেনিসিয়া আগের মতোই অস্ট্রিয়ার অধীনে থেকে যায়।

ইতিমধ্যে পার্মা, মোডেনা, টাস্কেনি প্রভৃতি মধ্য-ইতালির রাজ্যগুলো পিডমন্ট সার্ডিনিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে চায়। ক্যাভুর ফ্রান্সকে স্যাভয় ও নিস দিয়ে এই সংযুক্তির ব্যাপারে তার সাহায্য নেন। একটি গণভোটের আয়োজন করে সংযুক্তিটিকে বৈধ ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে রোম বাদ দিয়ে পোপের রাজ্য অ্যামব্রিয়া (Umbria) ও মার্চেস (Marches) ক্যাভুর জয় করে নেন। ঐক্যবদ্ধ হয় উত্তর ও মধ্য ইতালি। বাকি থাকে দক্ষিণ ইতালি।

৪.৬ গ্যারিবল্ডি

দক্ষিণ ইতালির সংযুক্তিকরণে মাৎসিনির শিষ্য গ্যারিবল্ডির 'লাল কুর্তা' বাহিনীর সামরিক অভিযান ও কাভুরের কূটনৈতিক প্রয়াস উল্লেখযোগ্য। সাধারণতন্ত্রে বিশ্বাসী জঙ্গী বিপ্লবী গ্যারিবল্ডি সিসিলি ও নেপল্‌স্ জোর করেই অধিকার করেছিলেন। কিন্তু তা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী হওয়ায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রনেতারা আপত্তি জানিয়েছিলেন। তখন গোপনে গ্যারিবল্ডিকে সমর্থন করেও প্রকাশ্যে কাভুর এই কাজের সঙ্গে সার্ডিনিয়ার সম্পর্ক অস্বীকার করেন। আবার তলে তলে ইতালির জাতীয় রাষ্ট্রের পক্ষে সিসিলি ও নেপল্‌সে জোর প্রচার চালান। ফলে গণভোট করে সিসিলি ও নেপল্‌সের মানুষ কাভুরের ইতালির পক্ষে যোগ দেয়। গণভোটের মাধ্যমে এই সংযুক্তি সম্ভব হয় বলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোও আর আপত্তি করেনি।

কিন্তু বিপদ দেখা দেয় যখন গ্যারিবল্ডি রোম অভিযান শুরু করেন। প্রথমত, রোমের প্রহরায় ফরাসি বাহিনী নিযুক্ত ছিল। সুতরাং গ্যারিবল্ডির রোম অভিযান ফরাসি হস্তক্ষেপ নিয়ে এলে ঐক্যের পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, গ্যারিবল্ডি কট্টর সাধারণতন্ত্রী হওয়ায় ইতালিতে রাজতন্ত্রী ও সাধারণতন্ত্রীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের আশংকা ছিল। কাজেই বাধ্য হয়ে কাভুর আপাতত গ্যারিবল্ডিকে নিরস্ত করতে পিডমন্ট সার্ডিনিয়ার রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েলকে পাঠিয়েছিলেন। গ্যারিবল্ডি নিজেও বিপদ বুঝতে পেরে ইম্যানুয়েলের হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে ক্যাপরেরা দ্বীপের কৃষি-খামারে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে চলে যান। উত্তরে ভেনিসিয়া ও মধ্যে রোম ছাড়া

বাকি ইতালি ঐক্যবদ্ধ হয়। এই সময়েই মৃত্যু হয় কাভুরের। তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৬৬ সালে অস্ট্রিয়া-প্রাশিয়ার 'সাদোয়া'র যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয়ের ফলে ভেনিসিয়া ইতালিতে যোগ দেয়, আর ১৮৭০ সালে সেডানের যুদ্ধে প্রাশিয়ার হাতে ফ্রান্সের পরাজয়ের ফলে রোম থেকে ফরাসি সেনা সরে যায় এবং রোম ইতালির সঙ্গে যুক্ত হয়। এইভাবে মাৎসিনি-কাভুর-গ্যারিবল্ডির স্বপ্ন পূর্ণ হয়, ঐক্যবদ্ধ হয় গোটা ইতালি। পিডমন্ট-রাজ ভিক্টর ইম্যানুয়েল ইতালির রাজা হিসেবে স্বীকৃত হন।

৪.৭ মূল্যায়ন

যদিও ইতালির চূড়ান্ত ঐক্য কাভুর দেখে যেতে পারেননি, তবু ইতালির ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্রের উত্থানে তাঁর অবদানই ছিল সবচাইতে বেশি। বাস্তববাদী কূটনীতিবিদ হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে, মাৎসিনির আদর্শবাদ আর গ্যারিবল্ডির সামরিক প্রতিভার সমন্বয় সাধন করে করে তিনি ইতালিকে আধুনিক রাষ্ট্রের স্তরে উন্নীত করেছিলেন। গ্যারিবল্ডি ছিলেন ইতালির 'রোমান্টিক হিরো'। মাৎসিনির 'ইয়ং ইতালি' আন্দোলনে দীক্ষিত গ্যারিবল্ডি ১৮৪৮-এ ফরাসি বাহিনীর হাত থেকে রোমানা প্রজাতন্ত্রকে বাঁচিয়েছিলেন, ১৮৫৯-এ লেক কোমো-তে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছিলেন, আর কালাটাকিমি ও ভলটার্নের যুদ্ধ জিতে সামন্তরাজদের হাত থেকে সিসিলি-নেপ্‌ল্‌স্‌কে উদ্ধার করে কাভুরের পথ মসৃণ করে দিয়েছিলেন। কাভুরের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক মতবিরোধ ছিল, কিন্তু দুজনেই ছিলেন জাতীয়তাবাদী।

ইতালি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু মাৎসিনির মূল স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছিল, একথা বলা যাবে না। ইতালির কৃষকরা তখনো জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ ছিল না। কূটনীতি ও যুদ্ধের মাধ্যমে ইতালির ঐক্য এসেছিল। রেলপথ ছিল না, শিল্প ছিল না, ছিল যুদ্ধের আর্থিক চাপ আর এক রাজার শাসন। সংসদ থাকা সত্ত্বেও সাধারণের অধিকার ছিল সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ জাতীয় রাষ্ট্র আর তার জাতীয় সমরবাহিনী তৈরি হয়েছিল, গড়ে ওঠেনি জাতীয় সমাজ বা জতীয় মন। সম্ভবত অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে এই কারণেই ইতালিতে সহজে ফ্যাসিবাদ মাথা চাড়া দিয়েছিল, সুতরাং গ্রেনভিল যখন হতাশার সুরে বলেন, "Cavour saw Mazzini's ideas defeated", তখন সেই হতাশাকে নিরর্থক বলা যায় না।

৪.৮ বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে জার্মানির সংগঠন প্রস্তুতি

উনিশ শতকে বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে শুধু ইতালিরই অভ্যুদয় হয়নি, জার্মানিরও হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের সময় জার্মানীও ছিল একটি 'ভৌগোলিক সংজ্ঞা' মাত্র। প্রায় তিনশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জার্মান রাজ্যকে নেপোলিয়ন প্রথমে পনেরোটি অঞ্চলের 'রাইন যুক্তরাজ্যে' (Confederation of the Rhine) পরিণত করেন, জার্মানদের

মধ্যে জাগিয়ে তোলেন ঐক্যের স্বপ্ন। কিন্তু ১৮১৫ সালের ভিয়েনা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে জার্মানি আবার উনচল্লিশটি রাজ্যে বিভক্ত হয় এবং প্রতিষ্ঠিত হয় অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব। জার্মান শাসকবর্গের প্রতিনিধিসভা ডায়েট (Diet) -কে অস্ট্রিয়াই নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে, জার্মান জাতীয় চেতনা নিষ্পেষিত হতে থাকে মেটারনিখ ব্যবস্থা ও কার্লসবাড ডিক্রির যাঁতাকলে। ১৮৩০ সালে ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে হ্যানোভার, হেসি, স্যাক্সনি প্রভৃতি রাজ্যে আন্দোলন শুরু হয়। মেটারনিখ তৎপরতার সঙ্গে তা দমন করেন।

কিন্তু তবুও ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকে যে জাতীয় ঐক্যের চেতনা একটু একটু করে জার্মানদের মনে চারিয়ে যাচ্ছিল, তা সমূলে উৎপাটিত হয়নি। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রগতিশীল চিন্তার ধারা, ফিকটে, হেগেল বা স্টেইনের দর্শন জার্মানিতে মবজাগৃতি নিয়ে আসে, গভীর জাতীয় আবেগের জন্ম দেয়। ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ঢেউয়ে জার্মান রাজ্যগুলোও আন্দোলিত হয়েছিল। ব্যাভেরিয়া, ব্যাডেন, স্যাক্সনি, হ্যানোভার-এ শাসন-সংস্কারের দাবিতে গণ-আন্দোলন দেখা যায় এবং প্রাশিয়ারাজ চতুর্থ ফ্রেডরিক উইলিয়ম-সহ অন্যান্যরা কিছু সংস্কার করতে বাধ্য হন। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য গঠিত হয় ফ্রাঙ্কফুট পার্লামেন্ট। অবশ্য অচিরেই গণ আন্দোলনের বেগ স্তিমিত হয়ে আসে। জার্মান রাজ্যগুলোকে এক কাঠামোয় নিয়ে আসার এরফুর্ট প্রস্তাব অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্যোয়ার্জেনবার্গ (Schwarzenberg) -এর বিরোধিতায় নাকচ হয়ে যায়। ১৮৫০-এর ওলমুজের চুক্তিতে প্রাশিয়া জার্মানিতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য মেনে নেয়। ১৮৬১ সালে প্রাশিয়ার সিংহাসনে বসেন প্রথম উইলিয়ম, ১৮৬২ সালে তিনি ব্যান্ডেনবার্গের অভিজাত সন্তান রাশিয়ায় প্রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত অটো ফন বিসমার্ককে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী করে নিয়ে আসেন। শুরু হয় জার্মান জাতীয় রাষ্ট্রগঠন প্রস্তুতির দ্বিতীয় অধ্যায়।

৪.৯ অটো ফন বিসমার্ক

"প্রখর বাস্তববাদী এই ব্যক্তি কোন অসীম উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাজ করতেন না"—বিসমার্ক সম্পর্কে এই উপলব্ধি গ্রেণভিলের। কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। গণতন্ত্র ও সংসদীয় রাজনীতির ওপর তাঁর সামান্যতম আস্থাও ছিল না। তিনি একক সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করতেন। জার্মান স্বার্থের চাইতেও প্রাশিয়ার স্বার্থ তাঁর কাছে বড় ছিল। এক জার্মান রাষ্ট্রে প্রাশিয়ার বিলুপ্তি তিনি চাননি। প্রাশিয়ার নেতৃত্বে এক জার্মান রাষ্ট্র ছিল তার অভীষ্ট। এই সিদ্ধি লাভের জন্য তিনি বিবেকহীন কূটনীতিতেও পিছপা নন। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের কাছে প্রাশিয়ার উদ্দেশ্য তাই তিনি ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতেন। ফরাসি সম্রাটকে তিনি একজোট হয়ে ভিয়েনাব্যবস্থা ভেঙে ফেলার লোভ দেখিয়েছিলেন। আবার, অস্ট্রিয়াকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, জার্মান কনফেডারেশন গঠন করে তার ওপর প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার যৌথ কর্তৃত্ব স্থাপিত হোক।

যাই হোক, বিসমার্ক যখন ক্ষমতায় আসেন, তখন প্রোটেস্ট্যান্ট প্রাশিয়া সামরিক ও আর্থিক শক্তিতে জার্মানির মধ্যে সবচাইতে অগ্রণী রাষ্ট্র। জার্মান শুল্ক সংঘের নেতা। ১৮১৯ সালে, ভিয়েনা সম্মেলনের পর পরই

'জোলভেরেন' (Zollverein) নামে এই শুল্ক সংঘটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৫০ সাল নাগাদ প্রায় সব জার্মান রাজ্যই এই সংঘে যোগ দিয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল গোটা জার্মান ভূখণ্ডে এক শুল্কনীতি বা অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রতিষ্ঠা করা। জোলভেরেন-এর মাধ্যমে জার্মান রাজ্যগুলোর শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নই সাধিত হয়নি, অর্থনৈতিক ঐক্যের ভিত্তিও তৈরি হয়েছিল। এই ভিত্তিটিই শক্ত করতে চেয়েছিলেন বিসমার্ক।

বিসমার্ক বুঝতে পেরেছিলেন, জার্মান ঐক্য প্রাশিয়ার নেতৃত্বেই আসবে। কিন্তু জনতার ভূমিকা পছন্দ করতেন না বলে, বা ইতিহাসে জনতার গুরুত্ব মানতেন না বলে, আন্দোলনের পথে না হেঁটে কূটনীতি ও যুদ্ধনীতির পথে হাঁটার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। অর্থাৎ তিনি মনে করতেন, জাতি তৈরি হয় রাজকর্তৃত্বকে কেন্দ্র করে। এক্ষেত্রে প্রাশিয়ার রাজকর্তৃত্ব হবে জার্মান জাতির কেন্দ্র। তার শক্তি জোগাবে অর্থবান জার্মানগোষ্ঠী, আবার ঐ অর্থবান গোষ্ঠীর জন্যই বিসমার্ক এক জাতি এক রাষ্ট্রের বিশাল বাজার নিশ্চিত করবেন। এই নিশ্চিতি অর্জিত হবে সামরিক বলপ্রয়োগের মাধ্যমে, অস্ট্রিয়াকে হাটিয়ে, দুর্বল করে আর সব জার্মান রাজ্যকে এক শাসনকর্তৃত্বের শেকলে বেঁধে রেখে। এইভাবেই বিসমার্কের ভাবনায় ও পরিকল্পনায় তত্ত্বস্থ হয়েছিল 'রক্ত ও লৌহে'র যুদ্ধনীতি (Policy of Blood and Iron)। কিন্তু এই নীতিতে সাধারণ নাগরিকের কোন গুরুত্ব না থাকলেও এর রূপায়ণের স্বার্থে তাদের মৌন সমর্থন জরুরী ছিল। এই সমর্থন বিসমার্ক আদায় করেছিলেন জার্মান উদারপন্থীদের প্রভাব কৌশলে ব্যবহার করে।

৪.১০ জার্মান উদারপন্থীদের ভূমিকা

ফরাসী বিপ্লবের মুক্তপন্থার আদর্শ (Liberalism) জার্মানিতেও ছড়িয়েছিল। জার্মান জাতীয়তাবাদী উদারপন্থীরা একটি ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক জাতিরাষ্ট্র চেয়েছিলেন। জার্মান জনতার সমর্থন তাদের দিকেই ছিল। এই উদারপন্থীরা কর্তৃত্ববাদ ও সমরবাদের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ১৮৪৮-এর গণ আন্দোলনের ব্যর্থতা তাদের হতোদ্যম করে দেয়। উদারপন্থীরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যান। একদল ভাবতে থাকেন, উত্তর জার্মানির অস্ট্রিয়া-প্রাধান্যের চাইতে দক্ষিণ জার্মানির অস্ট্রিয়া-প্রাধান্য তুলনায় দুর্বল। তাছাড়া সেখানকার ক্যাথলিকরা ফরাসি ক্যাথলিকদের সহানুভূতি পায় বলে অস্ট্রিয়া সেখানে যথেষ্ট কঠোর নয়। তাই দক্ষিণ জার্মানিতে আবার গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং তার মাধ্যমেই জার্মান জাতীয় রাষ্ট্র অর্জিত হবে। কিন্তু আর একদল মনে করেন, গণ-আন্দোলনের চাইতেও বেশি জরুরী যে কোনভাবে ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্রগঠন। ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর জার্মানি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হবে। সেই রাষ্ট্রের ক্ষমতায় প্রবেশ করে সাংবিধানিক উপায়ে তখন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। প্রথম দলটির সভ্যরা জার্মানিতে পরিচিত হন 'উদারী-গণতান্ত্রিক (Liberal Democrat) হিসেবে, দ্বিতীয় দলের সভ্যরা পরিচিত হন 'উদার জাতীয়তাবাদী' (Liberal National) নামে। এরাই পরে National Liberal Party গঠন করেন। এদের দলটিকেই নিজের স্বার্থে কাজে লাগিয়েছিলেন

বিসমার্ক। যেহেতু এরাও যে কোন উপায়ে ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্র চেয়েছিলেন, তাই বিসমার্কের 'রক্ত ও লৌহে'-র নীতিকে প্রশ্রয় দিতে আপত্তি হয়নি এদের।

৪.১১ বিসমার্কের 'রক্ত ও লৌহ'-নীতির প্রয়োগ এবং জার্মান ঐক্য

উদার-জাতীয়তাবাদীদের সমর্থন সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বিসমার্ক তার রক্ত ও লৌহের নীতি অনুসরণ করতে শুরু করেন। জার্মান জাতীয় সভা তার সমরসজ্জার জন্য অতিরিক্ত অর্থবরাদ্দে আপত্তি জানানোয় তিনি শুধু উচ্চকক্ষের সম্মতি নিয়ে করস্থাপন করেন। সমরসচিব ভনরুন ও সেনাপতি মল্টকে-র সাহায্যে কিছুদিনের মধ্যেই প্রাশিয়ার বাহিনীকে ইউরোপের অন্যতম সেরা সমরবাহিনীতে পরিণত করেন। পোল-বিদ্রোহ দমনে রাশিয়াকে সাহায্য করে তিনি রুশ জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের কৃতজ্ঞতাভাজন হন। ইংল্যান্ডের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। ফ্রান্সও ততদিনে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের অব্যবস্থিতচিত্ততার জন্য ইউরোপীয় রাজনীতিতে বিচ্ছিন্ন। ফলে বিসমার্কের পক্ষে যুদ্ধ পরিস্থিতি ছিল অনুকূল। এই অবস্থায় ১৮৬২ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত তিনটি যুদ্ধের সাহায্যে বিসমার্ক জার্মানির ঐক্য সম্পূর্ণ করেন।

বিসমার্কের প্রথম যুদ্ধটি ছিল ডেনমার্কের সঙ্গে। ১৮৬৩ সালে ডেনমার্ক শাসন-সংস্কারের নামে জার্মান অধ্যুষিত শ্লেজহিগ ও হলস্টাইন রাজ্য দুটি সম্পূর্ণ গ্রাস করতে চাইলে বিসমার্ক আপত্তি জানান এবং এ ব্যাপারে তিনি অস্ট্রিয়ার সমর্থনও আদায় করে নেন। বিসমার্কের আপত্তিকে ডেনমার্ক অগ্রাহ্য করলে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া একযোগে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ডেনমার্ক যুদ্ধে হেরে যায় এবং ১৮৬৪-তে ভিয়েনায় এক সন্ধি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। ডেনরাজ নবম খ্রীস্টিয়ান শ্লেজহিগ হলস্টাইনের ওপর সব অধিকার ছেড়ে দেন। ১৮৬৫-র গেস্টিনের চুক্তিতে শ্লেজহিগে প্রাশিয়ার এবং হলস্টাইনে অস্ট্রিয়ার আধিপত্য স্বীকৃত হয়।

এরপরই বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। অস্ট্রিয়ার হাত থেকে ভেনিসিয়া যাতে ইতালির হাতে যায়, সেই ব্যাপারে আশ্বাস দিয়ে তিনি ইতালিকে দলে টেনে নেন। ১৮৬৬ সালে শ্লেজহিগ-হলস্টাইন প্রশ্নটি অস্ট্রিয়া জার্মান কনফেডারেশনের সভায় উত্থাপন করলে, গেস্টিনের চুক্তি লঙ্ঘন করা হয়েছে, এই অজুহাতে বিসমার্ক হলস্টাইন আক্রমণ করে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দেন। সাত সপ্তাহের যুদ্ধের পর অস্ট্রিয়া সাদোয়া-য় শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। প্রাগের সন্ধি অনুসারে পুরনো জার্মান কনফেডারেশনের বিলুপ্তি ঘটিয়ে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে উত্তর জার্মান রাষ্ট্রজোট স্থাপিত হয়। ভিয়েনা-কেন্দ্রিক ইউরোপের রাজনীতি হয়ে ওঠে বার্লিন-কেন্দ্রিক।

প্রাশিয়ার এই উত্থানে ফ্রান্সের কূটনৈতিক পরাজয় ঘটে। স্বভাবতই উত্তেজিত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ফরাসি-সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন। ঠিক এই সময়ে স্পেনের সিংহাসনের উত্তরাধিকারের প্রশ্নে প্রাশিয়ার সঙ্গে

ফ্রান্সের বিরোধ দেখা দেয়। ১৮৬৯ সালে প্রজাবিদ্রোহের মুখে স্পেনের রানী ইসাবেলা দেশ ত্যাগ করলে স্পেন-এর অভিজাতগোষ্ঠী দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানির এক ক্ষুদ্র রাজ্যের যুবরাজ লিওপোল্ডকে স্পেনের সিংহাসনে বসার আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু প্রাশিয়া ও স্পেন একই হোহেনজোলার্ন বংশের হাতে চলে যাবে, এটা মেনে নিতে রাজি হননি ফরাসি সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন। তিনি কাউন্ট বেনেদিতিকে দূত হিসেবে এমস্ নামক এক স্বাস্থ্যনিবাসে প্রাশিয়ারাজ প্রথম উইলিয়মের কাছে পাঠিয়েছিলেন ফ্রান্সের আপত্তি জানাবার জন্য। প্রথম উইলিয়ম সে আপত্তি অগ্রাহ্য করেন এবং খবরটি টেলিগ্রাম করে বিসমার্ককে জানান। চতুর বিসমার্ক 'এমস টেলিগ্রামে'র অংশবিশেষ বিকৃত বিবরণসহ এমনভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন, যাতে মনে হয় ফরাসি দূত জার্মানির হাতে অত্যন্ত অপমানিত হয়েছেন। ফরাসি জনমত প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তৃতীয় নেপোলিয়নের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং সম্রাট প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে বাধ্য হন। ১৮৭০-এর সেপ্টেম্বরে সেডানের যুদ্ধে ফরাসিবাহিনী প্রাশিয়ার হাতে বিধ্বস্ত হয়। ১৮৭১-এর মে মাসে সম্পাদিত ফ্রাঙ্কফুর্ট চুক্তি অনুযায়ী ফ্রান্স আলসাস লোরেন, মেৎস দুর্গ, স্ট্রাসবুর্গ প্রাশিয়ার হাতে তুলে দেয় এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাঁচশ কোটি ফ্রাঁ প্রাশিয়াকে দিতে রাজি হয়। দক্ষিণ জার্মানির ক্যাথলিকদের সব রকম সাহায্য দেওয়া থেকে ফ্রান্স বিরত হয়। ফলে দক্ষিণ জার্মানির রাজ্যগুলো অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রোটেস্ট্যান্ট প্রাশিয়ার নেতৃত্ব মেনে নেয় এবং উত্তর জার্মান রাষ্ট্রসংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়। এইভাবেই জার্মানি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাশিয়ার রাজা ঐক্যবদ্ধ জার্মানির সম্রাট হিসেবে স্বীকৃত হন। বিসমার্ক হন নতুন জার্মানির চ্যান্সেলর।

৪.১২ মূল্যায়ন

গণ-আন্দোলনের পথ ত্যাগ করে জার্মান জাতি-রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। এরপরেও বহু জার্মান ভাষাভাষী অঞ্চল জার্মানির বাইরে থেকে গিয়েছিল। সিম্যান বিসমার্ককে 'a man with a limited objective' বলে সমালোচনা করেছেন, কেননা জাতীয়তাবাদী দলের সমর্থন কৌশলে আদায় করে যুদ্ধনীতির সাহায্যে বিসমার্ক যে জার্মান রাষ্ট্র তৈরি করেছিলেন, তা ছিল ক্ষুদ্র জার্মান তত্ত্বের বাস্তব প্রকাশ। জাতীয়তাবাদীরা চেয়েছিলেন জার্মান রাষ্ট্রে প্রাশিয়ার বিলুপ্তি, বিসমার্ক ঘটিয়েছিলেন প্রাশিয়ারাষ্ট্রে জার্মানির বিলুপ্তি। সেই অর্থে জার্মানির ঐক্য ছিল প্রাশিয়ার প্রাধান্য অর্জনের প্রয়াসের প্রায়োগিক পরিণতি। ডেভিড টমসন ভুল বলেননি যে ডেনমার্কের প্রতি, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের প্রতি যে নীতি বিসমার্ক গ্রহণ করেছিলেন, তা শুধু প্রাশিয়ার শক্তি বিস্তারের উদ্দেশ্যেই।

কিন্তু তবু বিসমার্ককে জার্মান জাতি রাষ্ট্র থেকে আলাদা করে ভাবা সম্ভব নয়। দূরদৃষ্টি নিয়ে নির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক কাজ করবার যে দক্ষতা তিনি দেখিয়েছিলেন, তা উনিশ শতকের ইউরোপের ইতিহাসে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

জার্মান জাতি-রাষ্ট্র সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। প্রাশিয়ার সুবিধাবাদ, বলপ্রয়োগের নীতি এসব ত্রুটি অবশ্যই ছিল। কিন্তু তবুও উনিশ শতকের ইউরোপের ইতিহাসে জার্মান জাতিরাষ্ট্রের গঠন ফরাসি বিপ্লবের মতোই সুদূরপ্রভাবী ঘটনা। পরবর্তীকালে জার্মান জাতির উগ্রতা ইতিহাসের সমস্যা তৈরি করেছিল, কিন্তু সেই সময়ে ইউরোপীয় মনীষায় জার্মানির একটি উজ্জ্বল স্থান ছিল। জার্মানি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর ব্রিটিশ দার্শনিক কার্লাইল 'Times' পত্রিকায় লিখেছিলেন, "That...Germany should be at length welded into a nation and become Queen of the continent...seems to me the hopefullest public fact that has occurred in my time."

৪.১৩ অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে ভাঙন

ইতালি ও জার্মানি যখন ইউরোপে বৃহৎ জাতি-রাষ্ট্রের কাঠামো হাজির করেছিল, ঠিক সেই সময়েই স্পষ্ট হয়েছিল পুরনো ধাঁচের সাম্রাজ্যগুলোর ভাঙন। দুটো সাম্রাজ্যের কথাই এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। একটি হল অস্ট্রিয়ার হ্যাপস্‌বুর্গ সাম্রাজ্য আর অন্যটি অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্য।

অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য ছিল দশ-বারোটি জাতির সমাবেশ স্থল। ছিল জার্মান, হাংগারিয়ান ম্যাগিয়ার আর নানা উপজাতির লোক—যেমন রুমেনিয়ান, চেক, স্লোভাগ, সার্ব, পোল ইত্যাদি। ইতালি ও জার্মানিতে জাতি-রাষ্ট্র স্থাপন এইসব জাতি উপজাতির মনেও জাতীয়তাবাদী ঢেউ তুলে দিয়েছিল। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের ঢেউ, হাংগারিতে কোসুথের (Kossuth) নেতৃত্বে বিদ্রোহ অস্ট্রিয়ারাজ নিষ্ঠুরভাবে সামাল দিয়েছিলেন, কিন্তু ১৮৬০-এর দশকে তিনি আর তা পারেননি। ১৮৬৭ সালে অস্ট্রিয়ারাজ ফ্রান্‌জ্‌ জোসেফ হাংগারীর জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে বাধ্য হন। এই আপসরফা (Ausgleich) নামে পরিচিত। বিদেশনীতি ও প্রতিরক্ষা ছাড়া অন্য সব বিষয়ে হাংগারীকে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে দেন, প্রতিষ্ঠিত হয় অস্ট্রো-হাংগেরীয় দ্বৈতশাসন। ১৮৬৮-তে হাংগারীর দুই নেতা ডিক (Deak) ও এওত্বোস (Eotvos) আবার ক্রোটদের স্বতন্ত্র শাসনের প্রতিশ্রুতি দেন। এই প্রতিশ্রুতি যদিও রক্ষিত হয়নি এবং এরপরেও সার্ব, রুমানীয়, স্লোভাক প্রভৃতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার জোর খাটিয়েই দাবিয়ে রাখা হয়, কিন্তু অস্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যে ভাঙনের চিহ্ন তখন থেকেই ছিল স্পষ্ট, এবং তা সম্পূর্ণ হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পর হাংগারীর স্বাধীনতা প্রাপ্তির ফলে।

৪.১৪ তুর্কী সাম্রাজ্যের ভাঙন

অটেমান তুর্কীরা ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের বল্কান উপদ্বীপে এসেছিল পনেরো শতকে; কনস্টানটিনোপল তাদের দখলে আসে ১৪৫২ সালে। গড়ে ওঠে বিশাল তুর্কী সাম্রাজ্য। কৃষ্ণসাগরের তীর থেকে ভূমধ্যসাগরের ক্রীট ও সাইপ্রাস, আফ্রিকার উত্তরাংশ-মিশর থেকে মরক্কো পর্যন্ত আর লেবানন থেকে আরব ভূখণ্ড পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন কনস্ট্যানটিনোপল-ইস্তাম্বুলের তুর্কী সুলতান।

আঠারো শতক থেকেই এই তুর্কী সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়তে শুরু করেছিল। অস্ট্রিয়া-রাশিয়ার চাপে, নেপোলীয়নীয় ধাক্কায় আর মেটারনিখ ব্যবস্থার আঘাতে তুর্কী সাম্রাজ্য ক্রমশ আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে ফরাসি বিপ্লবের স্বাধীনতার বাণী তুর্কী-অধীন ছোট ছোট জাতিগুলোকে উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করে। তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহী হয় সার্বরা। ১৮২৭ সালে তারা সীমিত স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। এরপর স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু করে গ্রীকরা। মেটারনিখ-এর বিরোধিতা করা সত্ত্বেও ফ্রান্স, প্রাশিয়া, ব্রিটেন, রাশিয়ার প্রশ্রয় গ্রীক খ্রীষ্টানরা পেয়েছিল। তারা স্বাধীন হয়ে যায় ১৮৩০ সালে। এরপর স্বাধীন হয় রুমানিয়া ১৮৫৬ সালে।

এইভাবে একের পর এক স্বাধীনতা আন্দোলন আর বল্কান জাতীয়তাবাদের ধাক্কায় ক্রমেই তুরস্ক 'sickman of Europe' এ পরিণত হয়। শুধু খ্রিস্টানরাই নয়, মিশর-আলবেনিয়ার জাগরণও তুরস্কের সমস্যা তৈরি করেছিল। এই সুযোগে রাশিয়া চেয়েছিল তুর্কী সাম্রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করতে। কিন্তু রাশিয়ার এই প্রয়াসে আপত্তি ছিল ইংরেজদের কারণ মিশর হয়ে লোহিতসাগর তীর ধরে ভারতের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যপথ চালু ছিল। তুরস্কের ওপর রুশ আধিপত্যে সেই পথ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। বল্কান অঞ্চলে অস্ট্রিয়া রাশিয়ার প্রাধান্য দেখতে প্রস্তুত ছিল না। ভূমধ্যসাগরে রুশ শক্তিবৃদ্ধি ইতালিরও পছন্দ ছিল না।

কিন্তু গ্রীকচার্চের খ্রিস্টানদের নিরাপত্তা রক্ষার অজুহাতে রাশিয়া বল্কান অঞ্চলে হাত বাড়াতে ছিল বদ্ধপরিকর। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালিও তাকে বাধা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। এর ফলেই হয়েছিল ১৮৫৪-৫৬-র ক্রিমিয়ার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে হেরেও রাশিয়া নিরস্ত হয়নি। তার মদতক্রমেই বল্কানদের জাতীয় আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৮৭০-এর দশকের বল্কান যুদ্ধের পর বুলগেরিয়া, সার্বিয়া ও মিন্টিনিগ্রো তুর্কী সাম্রাজ্য ভেঙে বেরিয়ে আসে। ১৮৭৮-এর বার্লিন চুক্তিতে এই রাজ্যত্রয়ের পৃথক অস্তিত্ব ইউরোপ মেনে নেয়। তবে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা তুরস্কের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে অস্ট্রিয়ার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের স্বার্থসন্ধান যাই হোক না কেন, একদিকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আর অন্যদিকে রাষ্ট্র-কূটনীতির অভিঘাতে তুরস্ক সাম্রাজ্য দ্রুত ভাঙনের দিকে এগিয়ে যায়। এই ভাঙন সম্পূর্ণ হয় প্রথম মহাযুদ্ধের পর।

৪.১৫ সারসংক্ষেপ

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ছিল বৃহৎ জাতিরাষ্ট্র গঠনের যুগ। জাতীয় চেতনা, ঐক্যের চেতনা ইতালি ও জার্মানির রাজ্যগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত গণ আন্দোলন নয়, কূটনীতি ও যুদ্ধের মাধ্যমে

ভিয়েনা ব্যবস্থা ধ্বংস করে ইতালি ও জার্মানি ঐক্যবদ্ধ হয়। ইতালিতে এই জাতিরাষ্ট্রগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন মাৎসিনি—কাভুর ও গ্যারিবল্ডি। জার্মান ঐক্যের নায়ক ছিলেন বিসমার্ক।

এই পর্বেই আবার জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতাকামী আন্দোলনের প্রবণতা অস্ট্রিয়া ও অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরায়। সুতরাং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একই সঙ্গে ছিল গঠন ও ভাঙনের যুগ।

৪.১৬ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন :

১। ইতালির ঐক্য আন্দোলনে মাৎসিনি, কাভুর ও গ্যারিবল্ডির অবদানের তুলনামূলক আলোচনা করুন। এই আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা কি?

২। জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসে বিসমার্ক কিভাবে রক্ত ও লৌহের নীতি প্রয়োগ করেছিলেন? এর নেতিবাচক দিক কি?

৩। উনিশ শতকে কিভাবে অস্ট্রিয়া ও অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্যে ভাঙন দেখা দিয়েছিল?

ছোট প্রশ্ন :

১। ইতালির জাতীয় চেতনা উন্মেষের কারণ কি?

২। মাৎসিনির রাজনৈতিক দর্শন কি ছিল?

৩। মাৎসিনির সঙ্গে কাভুরের রাজনীতির তফাৎ কোথায়?

৪। বিসমার্কের রাজনৈতিক ধারণার ব্যাখ্যা করুন।

৫। জার্মানির ঐক্যে জোলভেরিনের ভূমিকা কি ছিল?

৬। জার্মানির ঐক্য আন্দোলনে লিবারালদের অবদান কি?

৭। "এমস্ টেলিগ্রাম"-এর ঘটনাটি আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। 'কনসিলিয়েটর' কি?

২। ইতালির কয়েকজন জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীর নাম করুন।

৩। উনিশ শতকে ইতালিতে গুপ্তসমিতি কিভাবে গড়ে উঠেছিল?

৪। Risorgimento কি?

৫। "ইয়ং ইতালি" কিভাবে গঠিত হয়?

৬। পাদ্রী জিওবার্টি কে?

৭। জুরিখের সন্ধি কেন হয়েছিল?

৮। গ্যারিবল্ডির বাহিনীর নাম কি ছিল?

৯। "Confederation of the Rhine" কাকে বলা হত?

১০। ইউরোপের "Sickaman" কে?

৪.১৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। Bolton King : A History of Italian Unity

২। G.P. Gooch : Germany

৩। G. Barraclough : Rise of Modern Germany

৪। J. Grenville : Europe Reshaped

৫। A. J. P. Taylor : Struggle for Mastery of Europe

৬। A. J. P Taylor : Europe-Gramdeur and Decline